মহাভারত কাহিনী

স্বামী অমলানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম
বেলঘরিয়া

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ রামায়ণ ও মহাভারত। সমগ্র জগতে যে কয়খানি মহাকাব্য সর্বজন-প্রশংসিত, মহাভারত তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন ভাবের জীবন্ত আদর্শ চরিত্রের অভূতপূর্ব সমাবেশ আবার বিরুদ্ধ ভাবের মিলন এমনটি আর কোথাও পাওয়া দুষ্কর।

ঋষিকবি বেদব্যাস এই বিরাট গ্রন্থে সকল রকমের চরিত্রই সাফল্যের সঙ্গে এঁকেছেন। উচ্চতম ধর্মের আদর্শ থেকে অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার আলোচনা ও সমাধান এই মহাকাব্যে বিশদ্‌ভাবে করা হয়েছে। তাই মহাভারত আজও পুরোনো হয়নি।

কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থ সবার পক্ষে পাঠ ও আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়; বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এজন্য মূল মহাভারত অবলম্বনে সুকুমারমতি বালক-বালিকা এবং সাধারণ পাঠকের উপযোগী সহজ ভাষায় স্বামী অমলানন্দ 'মহাভারত কাহিনী' রচনা করেছেন। আগে অবশ্য ইনি 'রামায়ণ কাহিনী'ও রচনা করেছেন এবং ওটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর অর্জুন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, পতিপ্রাণা ও ধর্মপ্রাণা রাণী গান্ধারী, দ্রৌপদী এবং পুণ্যশ্লোক রাজর্ষিবৃন্দের অমূল্য জীবনকথা পাঠ করে বালক ও বালিকারা তৃপ্তিলাভ করুক এবং ভারতীয় সনাতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক—শ্রীশ্রী৺জগদম্বার চরণে এই প্রার্থনা।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মতিথি, ১৩৭৫ — প্রকাশক

সূচীপত্র

সভা পর্ব

বন পর্ব

বিরাট পর্ব

উদ্যোগ পর্ব

ভীষ্ম পর্ব

দ্রোণ পর্ব

কর্ণ পর্ব

শল্য পর্ব

সৌপ্তিক পর্ব

স্ত্রী পর্ব

শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব

অশ্বমেধ পর্ব

আশ্রমবাসিক পর্ব

মুষল পর্ব

মহাপ্রস্থান পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

বৈশম্পায়ন মুনি মহারাজ জনমেজয়কে মহাভারত শোনাচ্ছেন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য
নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব
ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ভূমিকা

'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'—বাংলার ঘরে ঘরে এই প্রবাদ বাক্যটি সুপরিচিত। বলা বাহুল্য, প্রথম ভারত শব্দটির অর্থ মহাভারত। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল কথাই আছে মহাভারতে। ভারতের ভৌগোলিক আয়তন যেমন বিরাট, তার জীবনধারার মধ্যেও তেমনি বহু বৈচিত্র্য। মহাভারত সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারত-জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ঋষি কবি বেদব্যাস তাই বলেছেন ঃ—

ধর্মে চার্থে চ কামে চ
মোক্ষে চ ভরতর্ষভ !
যদিহাস্তি তদন্যত্র
যন্নে হাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জীবনের চতুর্বর্গ—আছে মহাভারতে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যা থেকে আরম্ভ করে তার পরম মোক্ষলাভ পর্যন্ত সকল ভাবের সকল কথাই এই মহাকাব্য বলতে চেয়েছেন।

মহাভারত কি শুধু ধর্ম পুস্তক? আর ধর্ম বা মোক্ষ, সে ত আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ধর্মের কথা, মোক্ষের কথা, বলতে গিয়ে মহাভারত আমাদের কাছে মানুষের যে জীবন আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন তা সাধারণ মানুষের অপরিচিত বা দুরধিগম্য নয়—বরং একান্তভাবেই

পরিচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সুখ ও দুঃখ, যে জয় ও পরাজয়, যে সান্ত্বনা ও বঞ্চনা, তার সবটাই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মহাভারতের পর্বে পর্বে। আজকের দিনের জীবন-যুদ্ধের সঙ্গে হয়ত সেদিনের জীবন-যুদ্ধের অনেক বৈসাদৃশ্য আছে এবং তা থাকা স্বাভাবিকও। তবু বলব সাদৃশ্য আছে অনেকখানি। তাই কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান অতিক্রম করেও বিশ শতকের মানুষ এই মহাকাব্যের মধ্যে নিজ জীবনের বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে এবং অনুপ্রেরণা লাভ করছে জীবন পথে অগ্রসর হবার। মহাভারতের জনপ্রিয়তা শুধু আজ ভারতবর্ষেই নয় ভারতবর্ষের বাইরেও মহাভারতের পঠন-পাঠন ও আলোচনার কথা শুনতে পাই।

মহাকাব্য মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র মানবচরিত্রের এক একটি বৈচিত্র্যের বৈজয়ন্তী পতাকা। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধনুর্ধর পার্থ, দানবীর কর্ণ, মাতা কুন্তী, গান্ধারী ও দ্রৌপদী প্রমুখ মহৎ চরিত্রগুলি যে কোন দেশের যে কোন কালের গৌরব। তাঁরা সকলেই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। আবার তাঁদের পাশেই রয়েছেন স্নেহান্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র, অভিমানী দুর্যোধন, কুটিল শকুনি, ক্রুর চরিত্র জয়দ্রথ, জরাসন্ধ ও কীচক।

ভালমন্দ, ছোট-বড়, বহু চরিত্রের সমন্বয়ে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন সেই জীবনের ছবি এঁকেছেন মহাভারতের কুশলী মহাকবি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন—জীবনের শেষ পরিণতির দিকে, দেখিয়েছেন—জীবনকে মহাজীবনে পরিণত করার সুনির্দিষ্ট পথ। আর ঐসঙ্গে বলেছেন—পরম আশ্বাসের কথা—'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'। যা ভাল, যা সত্য, তা শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জয়ী হবে।

ব্যাসদেব কৃত মূল মহাভারত অবলম্বনে 'মহাভারত কাহিনী' রচিত হয়েছে। সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ করে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা যারা, সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে মহাভারতের কাহিনীকে সহজবোধ্য করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করেছি মহাভারতের মহান আদর্শকে সকলের কাছে তুলে ধরবার।

সাফল্য অসাফল্য বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকারা।

গ্রন্থকার

পূর্বাভাষ

রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। বড় হয়ে শুনলেন তাঁর পিতার নিদারুণ মৃত্যু কাহিনী। মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা পরীক্ষিত তৃষ্ণার্ত হন। তাঁর শিকারের হরিণটিও দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। কাছে একটি আশ্রমে ঢুকে তিনি এক মুনিকে দেখতে পেলেন। মুনির কাছে রাজা পানীয় জল চাইলেন আর হরিণটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শমীকমুনি তখন ধ্যান-মগ্ন। বাইরের কোন হুঁশ তাঁর ছিল না। কাজেই তৃষ্ণার জল বা কথার উত্তর, রাজা কিছুই পেলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনির গলায় একটি মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে এলেন।

কিছু পরে মুনিকুমার শৃঙ্গী এসে আশ্রমে ঢুকলেন। তিনি দেখলেন তাঁর পিতার গলায় একটি মৃত সাপ। রেগে তিনি অভিশাপ দিলেন—"যে আমার বৃদ্ধ পিতাকে এরূপ অবমাননা করেছে সে সাত দিনের মধ্যেই তক্ষক নাগের দংশনে প্রাণ হারাবে"।

শমীকমুনি ধ্যান ভাঙ্গার পর এই নিদারুণ অভিশাপের কথা শুনলেন ; পুত্রকে এজন্য তিরস্কারও করলেন অনেক। কিন্তু আর উপায় নেই। তপস্বী পুত্রের এই অভিশাপ অব্যর্থ। তাই তিনি রাজা পরীক্ষিতের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে

সাবধান করে দিলেন। মন্ত্রী ও পার্ষদেরা এই সংবাদ পেয়ে রাজার জীবন রক্ষার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করলেন। নিরাপদেই ছয়টি দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনের সূর্যও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছেন। দিনের শেষে রাজা যখন ফলাহারে বসেছেন এমন সময় একটি ফলের ভেতর থেকে এক ক্ষুদ্র কীট এসে তাঁকে দংশন করল। কীটটি আসলে তক্ষক নাগ স্বয়ং। তার দংশনে রাজা প্রাণ হারালেন।

পিতার এই শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য জনমেজয় সর্পমেধ যজ্ঞ করলেন। তাতে আহুতি দেওয়া মাত্র চারদিক থেকে নাগকুল যজ্ঞের অগ্নিতে পড়ে প্রাণ হারাল। কিন্তু তক্ষক কোথায়? সে প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছে। তবে তারও রক্ষে ছিল না। ঋত্বিকদের মন্ত্র শক্তিতে তাকেও আকাশ পথে আসতে হল। অবশ্য আস্তিক মুনির চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তক্ষকের প্রাণরক্ষা হয়েছিল।

জনমেজয়ের এই সর্পযজ্ঞে দেশবিদেশ থেকে মুনি ঋষিরা এসে সমবেত হয়েছিলেন। এসেছিলেন শিষ্য বৈশম্পায়নকে সঙ্গে করে স্বয়ং ব্যাসদেব। ইনিই বিপুলায়তন বেদশাস্ত্রকে সকলের বোধগম্য করার জন্য চারভাগে ভাগ করেছিলেন। ব্যাসদেবের কাছে রাজা বিনীত প্রার্থনা জানালেন—"আপনি আমার পূর্বপুরুষ পাণ্ডব ও কৌরবদের সকল বিষয় অবগত আছেন। তাঁদের কীর্তি কাহিনীর কথা কিছু বলুন"।

ব্যাসদেব ইতিপূর্বেই কুরুপাণ্ডবদের অমৃতময় কাহিনী-

রচনা সম্পূর্ণ করেছেন; এবং ব্রহ্মার আদেশে ঐ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন স্বয়ং গণপতি গণেশ। তাতে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন কুরুবংশের ইতিকথা, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা আর কুন্তীর ধৈর্য। সেই শক্তিধর কবি আরও বর্ণনা করেছেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, পাণ্ডবদের সত্য-নিষ্ঠা আর বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দুষ্কার্যের কথা।* শিষ্য বৈশম্পায়ন তা অধ্যয়ন করেছিলেন। ব্যাসদেবের আদেশে বৈশম্পায়ন সেই অমর কথা সমাগত সকলকে শোনালেন।

জনসমাজে মহাভারতের প্রথম প্রকাশ রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞশালায়। এই সভায় শ্রোতা ছিলেন সৌতিমুনি। পরে তিনি নৈমিষারণ্যে সুধী সমাবেশে তা প্রচার করেন। তারপর বিভিন্ন গাথা, আখ্যান, উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে মহাভারত আজ কোটি কোটি মানুষের হৃদয়-মন্দির আলোকিত করছে।

"বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাং চ সত্যতাম্
দুর্বৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্ ভগবান্ ঋষিঃ ॥"

আদি পর্ব

দেবব্রত ভীষ্ম

ভারতের রাজধানী দিল্লী। এই দিল্লীর অদূরে ছিল হস্তিনা নগর—গৌরবময় অতীতের পুণ্য লীলাভূমি। এখানে একদিন রাজত্ব করতেন মহারাজ ভরত। তাঁরই নামে আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। আর তাঁরই নামে হস্তিনার রাজবংশের নাম ভরত-বংশ। ভরত-বংশে অনেক বড় বড় রাজা রাজত্ব করে গেছেন। রাজা প্রতীপ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

পুত্র শান্তনুকে ডেকে রাজা প্রতীপ একদিন বললেন—"একটি দেবকন্যাকে আমি কথা দিয়েছি পুত্রবধূ করব বলে। তুমি তাকে গ্রহণ করো। আর শোনো, তার কোনো প্রিয় কাজে তুমি বাধা দিও না। যেদিন বাধা দেবে সেদিন কিন্তু সে চলে যাবে তোমার ঘর ছেড়ে।" একদিন সত্যি সত্যি এক অপরূপা দেবকন্যা এলেন শান্তনুর পত্নী হয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁদের যখন সন্তান হয়, একটির পর একটি ঐ দেবকন্যা ভাসিয়ে দেন গঙ্গার জলে। রাজা শান্তনুর বুক ফেটে যায় পুত্রশোকে। তবুও তিনি পিতার আদেশ স্মরণ করে নিজেকে অতি কষ্টে সংযত রাখেন। কিন্তু অষ্টম পুত্রের বেলায় তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না; বাধা দিলেন পত্নীর এই নিষ্ঠুর কাজে। দেবকন্যা তখন বললেন,

"কথা ছিল আপনি আমার কোন কাজে বাধা দেবেন না। কিন্তু আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন তখন আমি চললাম।"

এই দেবকন্যা হলেন স্বয়ং গঙ্গা দেবী ; আর এই ছেলেটি হলেন অষ্টবসুর একটি বসু। বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে এঁদের মানুষ হয়ে জন্মাবার কথা ছিল। গঙ্গাদেবী দয়া করে রাজী হয়েছিলেন তাঁদের জননী হতে। গঙ্গাদেবীর কৃপায় পূর্ববর্তী সাতজন বসু জন্মমাত্রেই মুক্ত হয়ে চলে গেলেন দেবলোকে। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে যিনি রইলেন তিনিই মহাবীর দেবব্রত বা ভীষ্ম। গঙ্গার তনয় বলে তাঁর আর এক নাম গাঙ্গেয়।

দেবব্রত ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করলেন নানা রকমের বিদ্যা ; যুদ্ধ বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী হয়ে উঠলেন। রাজা শান্তনু দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এমন সময় একদিন যুবরাজ দেবব্রত দেখলেন, পিতা বড় বিমর্ষ। রাজকার্যে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। কারণ অনুসন্ধান করে জানলেন দাশরাজের কন্যা সত্যবতীকে পিতা বিবাহ করতে চান। তিনি আরও জানলেন যে সত্যবতীর পিতা বলেছেন, "রাজা শান্তনুকে কন্যা দান করা মহা ভাগ্যের কথা। কিন্তু তার আগে রাজাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে সত্যবতীর পুত্রই হবে কুরুরাজ্যের রাজা।"

দেবব্রতের মত গুণবান্ ও বিদ্বান পুত্র থাকতে কোন্ পিতা এই সর্তে রাজী হতে পারেন ? শান্তনুও এতে রাজী হতে পারলেন না ; বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন রাজপুরীতে।

সবকথাই যুবরাজের কানে গিয়ে পৌঁছুল। তিনি দাশ-রাজের সাথে দেখা করে বললেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাজ-সিংহাসন আমি গ্রহণ করব না। এবার আশা করি আমার পিতাকে আপনি কন্যা সম্প্রদান করবেন।"

দাশরাজ তাতেও রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "আপনি সত্যবাদী ও ধর্মপ্রাণ; আপনার কথায় অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনার ছেলেরা যদি সিংহাসন দাবী করে?"

দেবব্রত বললেন, "জীবনে আমি কখনও বিবাহ করব না।"

দেবব্রত তার উত্তরে বললেন, "পূর্বেই বলেছি—আমি রাজ্য চাই না। এখন প্রতিজ্ঞা করছি আজ থেকে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলাম; জীবনে কখনও আমি বিবাহ করব না।"

তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় দাশরাজ খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং কন্যা সত্যবতীকে শান্তনুর হাতে অর্পণ করলেন।

দেবব্রত আজ যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন তাতে সন্তুষ্ট হলেন এই পৃথিবীর রাজা ও ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারা। প্রতিজ্ঞায় ভীষণ বলে ইনি অভিহিত হলেন ভীষ্ম নামে। পিতা শান্তনু ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন, "বৎস, যতকাল তুমি জীবিত থাকতে চাও ততদিন তোমার মৃত্যু নাই। মৃত্যুকে তোমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

রাজা শান্তনু ও রাণী সত্যবতীর দিনগুলি সুখে কাটতে লাগল। সত্যবতীর দুটি পুত্র হল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ধীরে ধীরে তাঁরা বড় হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন রাজা শান্তনু দেহত্যাগ করলেন। রাজ সিংহাসনে বসলেন চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ খুবই তেজস্বী ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি নিহত হলেন। বিচিত্রবীর্য তখনও নাবালক। তাই ভীষ্ম তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

এদিকে কাশীরাজ তাঁর তিনটি কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। তাতে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজকুমারকে। ভীষ্ম এলেন বিচিত্রবীর্যের প্রতিনিধি রূপে। ভীষ্ম নিজ বাহুবলে এই তিনটি রাজকুমারীকে জয় করলেন। কিন্তু অম্বা রাজী হলেন না বিচিত্রবীর্যকে পতিত্বে বরণ করতে। অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হল।

কুরুপাণ্ডবের জন্ম

অম্বিকার গর্ভে জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্রের আর অম্বালিকার গর্ভে এলেন পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হলেও জন্মান্ধ ছিলেন। তাই রাজ্য পেলেন ছোট ভাই পাণ্ডু। রাজপুরীতে এঁদের আর একজন বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন—তাঁর নাম বিদুর। বিদুর বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত ধীর ও ধার্মিক।

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হল গান্ধারের রাজকন্যা গান্ধারীর সঙ্গে। পতি অন্ধ; তাই সতী গান্ধারী নিজের চোখে বাঁধলেন কাপড়। পাণ্ডুর দুটি পত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী।

গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র এবং এক কন্যা। দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্মুখ প্রভৃতি; এঁরা কৌরব নামে খ্যাত। কন্যার নাম ছিল দুঃশলা। পাণ্ডুর পাঁচ জন পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এঁরাই হলেন পঞ্চপাণ্ডব। কুন্তী দেবী ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রদেবকে আরাধনা করে লাভ করেন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে। তাই যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র, ভীমকে বায়ুপুত্র, এবং অর্জুনকে ইন্দ্রপুত্র বলা হয়। মাদ্রীদেবী অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের আরাধনা করে পান প্রিয়দর্শন দুটি পুত্র—নকুল ও সহদেবকে। কৌরব এবং পাণ্ডব ভাইদের সকলের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন যুধিষ্ঠির।

পাণ্ডুরাজ অকালে দেহত্যাগ করেন। পাণ্ডুপুত্রেরা কৌরবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহযত্নে বড় হতে লাগলেন।

বাল্যক্রীড়া

আনন্দে দিন কাটছে পাণ্ডব ও কৌরবদের। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, হৈ হুল্লোড় করে খেলাধূলায় তাঁরা মেতে আছেন। গায়ের জোর ভীমের ছিল সকলের থেকে বেশী। তাঁর দাপটে কৌরবেরা অস্থির। ভীম যে কখন কি করে বসবেন তা কেউ জানে না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ভীম এসে দুজনের মাথা ঠুকে দিয়ে চলে যাবেন। কখনও বা আট দশ জনকে একসঙ্গে তুলে নিয়ে জলে ডুবিয়ে দেবেন। আবার রাজকুমারেরা গাছে উঠেছেন ফল খেতে। নীচে দাঁড়িয়ে ভীম গোটা গাছটিকে এমন নাড়া দেবেন যে তাঁরা সকলে টুপ টুপ করে মাটিতে পড়ে হাত পা ভাঙ্গবেন। ভীমের চেহারা ও শক্তির কথা চিন্তা করে কৌরবদের কারও সাহস হত না ভীমকে কিছু বলার। কিন্তু মনে মনে তাঁরা ভীমের উপর খুব বিরূপ ছিলেন। যুধিষ্ঠির বা অর্জুন এতটা দুরন্ত নন, তবে দুর্যোধন ভাবতেন বড় হয়ে ত রাজা হবেন যুধিষ্ঠির। কাজেই পাণ্ডবেরা হলেন কৌরবদের দুচোখের বিষ। কি করে পাণ্ডবদের ক্ষতি করা যায়, তা নিয়ে তাঁরা নানা ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

একদিন দুর্যোধন অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে বসে ঠিক করলেন ভীমকে জলে ডুবিয়ে মারতে হবে। পাণ্ডবদের ডেকে তাঁরা বললেন, "চল, আমরা একদিন জল-ক্রীড়া করি।" রাজধানীর বাইরে অনেক দূরে তাঁরা চলে গেলেন। গাছপালা লতা-পাতায় ঘেরা একটি মনোরম জলাশয়ের কাছে এসে তাঁরা

থামলেন। দুর্যোধন খুব মিষ্টি খাওয়ালেন ভীমকে। সেই মিষ্টির মধ্যে ছিল কালকূট বিষ। ভীমের অবশ্য প্রথমে কিছু হল না; কিন্তু খেলতে খেলতে এক সময় জলের ধারে ভীম অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনাদি ভীমকে না পেয়ে রাজপুরীতে চলে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন ভীম বোধ হয় আগেই বাড়ী চলে গেছেন। দুর্যোধন তখন লতা-পাতা দিয়ে ভীমের হাত পা বেঁধে তাঁকে গভীর জলে ফেলে দিলেন; দেহের ভারে ভীম চলে গেলেন গভীর থেকে গভীরতর জলের মধ্যে।

পাণ্ডবেরা এতক্ষণে ফিরে গেছেন রাজধানীতে। কিন্তু মা কুন্তীর কাছে শুনলেন, "কই ভীম ত আসেনি।" তখন তাঁদের দুর্ভাবনার অন্ত রইল না।

এদিকে ভীম উপস্থিত হয়েছেন নাগরাজের বাড়ীতে। সেখানে ছোট ছোট সাপ ভীমকে দংশন করতে লাগল। তাতে অবশ্য ভীমেরই ভাল হল। যে বিষ কৌরবরা তাকে খাইয়েছিল, সেই বিষ নষ্ট হল। বিষে হল বিষ ক্ষয়। নাগরাজ বাসুকি ছিলেন ভীমের মাতামহ কুন্তীভোজের বন্ধু। তিনি ভীমকে চিনতে পেরে খুবই আদর আপ্যায়ন করলেন, খাওয়ালেন প্রচুর অমৃত-রসায়ন। অমৃত-রসায়ন খেয়ে ভীম আরও হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে উঠলেন। তারপর ফিরে এলেন হস্তিনায়।

ফিরে এসে ভীম সব কথা জানালেন মাতা কুন্তীকে ও

জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির সবই বুঝলেন কিন্তু সাবধান করে দিলেন ভীমকে, তিনি যেন এই নিয়ে আর হৈচৈ না করেন।

দ্রোণাচার্যের আগমন

রাজকুমারেরা দুরন্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের দুরন্তপনায় সমস্ত রাজপুরী চঞ্চল। পিতামহ এবার তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিলেন প্রবীণ কৃপাচার্যের উপর।

একদিন একশত পাঁচ ভাই খেলতে খেলতে চলে গেছেন রাজধানীর বাইরে। সেখানে তাঁরা একটি কাঠের গোলক নিয়ে খেলা করছিলেন। কাছে ছিল একটি জলবিহীন কূপ। সেই কূপের মধ্যে পড়ল কাঠের গোলকটি। কুমারেরা গোলকটিকে কূপ থেকে তুলতে পারলেন না। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। মনের দুঃখে কুমারেরা মাটিতে বসে পড়লেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেখতে পেলেন—সামনে একটু দূরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করছেন। পাশে রয়েছে ধনুর্বাণ। ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে কুমারেরা জানালেন তাঁদের দুঃখের কথা। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন,—"খেলনাটি আমি কূপ থেকে তুলে দিচ্ছি। এ আর এমন কী শক্ত কথা! কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে। এই দেখ আমি আমার হাতের এই আংটিটিও ফেলে দিচ্ছি ঐ কূপের মধ্যে। তোমাদের কাঠের গোলক এবং এই আংটি উভয়ই এক্ষুণি উঠে আসবে।"

তারপর ব্রাহ্মণ করলেন এক মজার কাণ্ড। পাশে পড়েছিল কুশ ঘাস। একটির পর একটি কুশ বাণের মত তিনি নিক্ষেপ করলেন মন্ত্রপূত করে; তাই দিয়ে তুলে আনলেন কাঠের গোলকটি। আর একটি তীরে কূপের ভেতর থেকে তাঁর আংটি এল উঠে।

রাজকুমারেরা এই ব্যাপার দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। ভক্তিনম্র প্রণাম জানিয়ে তাঁরা জানতে চাইলেন ব্রাহ্মণের পরিচয়। ব্রাহ্মণ তাঁর পরিচয় কিছু না দিয়ে শুধু বললেন, "তোমরা পিতামহ ভীষ্মের কাছে জিজ্ঞাসা কোরো।" পিতামহ সব শুনে বললেন,—"উনি আর কেউ নন! নিশ্চয়ই মহাবীর দ্রোণাচার্য। ধনুর্বিদ্যায় এঁর সমকক্ষ মেলা ভার।" ভীষ্ম তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দ্রোণাচার্যকে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন হস্তিনায় তাঁর আগমনের হেতু কি?

দ্রোণাচার্য উত্তরে বললেন,—"তবে শুনুন আমার দুঃখের কথা। যৌবনের প্রথমে আমি ও রাজপুত্র দ্রুপদ একসঙ্গে একই গুরুর অধীনে অস্ত্রশিক্ষা করি। তখন আমাদের মধ্যে কি গভীর বন্ধুত্ব! পরস্পরকে আমরা এত ভালবাসতাম যে একদিন দ্রুপদ বলেছিল যে "বড় হয়ে আমি যখন রাজা হব তখন সেই রাজ্য আমরা দুজনে সমানভাবে ভোগ করব।" তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমি যেমন দরিদ্র ছিলাম তেমন দরিদ্র রয়ে গেলাম। আমার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার জন্য একফোঁটা দুধ সংগ্রহ করার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

দুধ কি বস্তু তা আমার ছেলে জানতো না। একদিন তার খেলার সাথীরা চালের পিটুলি গোলা খেতে দিল। তাই খেয়ে অশ্বত্থামা "দুধ খাচ্ছি" বলে আনন্দে নাচতে লাগল। সে করুণ দৃশ্য দেখে আমি বিচলিত হলাম। ভাবলাম আমার প্রাণের বন্ধু দ্রুপদ এখন পাঞ্চালের রাজা। তার কাছে গেলে একটা ব্যবস্থা হবেই। অর্থপ্রার্থী হয়ে গেলাম দ্রুপদের রাজপুরীতে। কিন্তু দ্রুপদ প্রত্যাখ্যান করল আমার প্রার্থনা। আর উপহাস করে বলল, বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। রাজায় আর পথের ভিক্ষুকে বন্ধুত্ব হয় না। অপমানের দারুণ জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছি। এখন একমাত্র সংকল্প দ্রুপদকে কি করে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়!" ভীষ্ম বললেন, "আপনাকে আমি এই রাজকুমারগণের অস্ত্রগুরু রূপে বরণ করছি; ধনরত্ন আপনার যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করুন; আব কুমারদের সুশিক্ষিত করে তুলুন অস্ত্রবিদ্যায়।"

দ্রোণাচার্য কুমারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। কুমারদের ডেকে তিনি বললেন, "তোমাদের আমি আমার সাধ্যমত সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দোব—কিন্তু শিক্ষা শেষ হলে তোমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হবে—পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করে।"

দ্রোণাচার্যের শিক্ষার গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কুমারগণ নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। তবে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বলে অর্জুন সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন।

উপযুক্ত শিষ্য পেলে গুরুর উৎসাহ বেড়ে যায়। অর্জুনের মত শিষ্য পেয়ে দ্রোণাচার্যেরও বুক আনন্দে ভরে উঠল। তিনি একদিন বললেন, "আমি তোমাকে এমনভাবে শিক্ষা দোব যে, স্বর্গমর্ত্য পাতালে তোমার মত আর ধনুর্ধর কেউ থাকবে না।" ৮

একলব্য

অস্ত্রগুরু দ্রোণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অস্ত্র-শিক্ষার জন্য তার কাছে বহু রাজকুমার আসতে লাগলেন। নিষাদপুত্র একলব্যও দ্রোণের কাছে এসে প্রার্থনা জানাল তাকে শিষ্য করে নেওয়ার। কিন্তু রাজপুত্র নয় বলে একলব্যের সে প্রার্থনা দ্রোণাচার্য প্রত্যাখ্যান করলেন।

একলব্য কিন্তু নিরাশ হল না। মনে মনে দ্রোণকেই গুরুত্বে বরণ করে সে প্রবেশ করল গভীর বনে। সেখানে তাঁর মূর্তি গড়ে তার সামনেই সে অস্ত্রশিক্ষা করতে লাগল এবং অল্পদিনের মধ্যে পারদর্শী হয়ে উঠল অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায়। মনের বাসনা গভীর ও ঐকান্তিক হলে মানুষ নিজের চেষ্টায় সকল বিদ্যা অর্জন করতে পারে; একলব্য তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

কিছুদিন পরে পাণ্ডব ও কৌরব রাজকুমারেরা মৃগয়ার জন্য গভীর বনের মধ্যে চলে গেছেন। একটি শিকারী কুকুরও ছিল তাঁদের সঙ্গে। রাজকুমারেরা জানতেন না একলব্যের কথা। এই বনেতেই সে অস্ত্রসাধনায় মগ্ন আছে। কুকুরটির

চিৎকারে একলব্যের সাধনার ব্যাঘাত ঘটল। কুকুরটি যেমনি একলব্যের কাছাকাছি গেল সে সাতটি শর দিয়ে কুকুরের মুখ দিল বন্ধ করে। অথচ কুকুরের মুখ থেকে রক্ত পড়ল না।

রাজকুমারদের কাছে কুকুরটি যখন ফিরে এল তখন তার আর শব্দ করার ক্ষমতা নেই। কুমারেরা স্তম্ভিত হল শর সন্ধানের এই কৌশল দেখে। কে এই কুশলী ধনুর্ধর! তাঁরা একটু অগ্রসর হয়ে আরও বিস্মিত হলেন; দেখলেন তাঁদেরই আচার্যের মৃন্ময় মূর্তি। তাঁর সামনে এক বালক অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—"আমি বনচারী নিষাদপুত্র একলব্য—দ্রোণাচার্যের শিষ্য। তাঁর কাছেই শিখেছি ধনুর্বিদ্যার সমস্ত কৌশল।"

দ্রোণাচার্য ছিলেন রাজপুরীতে। একান্তে তাঁর কাছে সমস্ত সংবাদ দিয়ে অর্জুন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—"আপনি বলেছিলেন ধনুর্বিদ্যায় আমাকে অদ্বিতীয় করে তুলবেন। কিন্তু নিষাদ পুত্র একলব্যকে আপনি শর সন্ধানের যে কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে ত তা শেখান নি!"

দ্রোণাচার্যের মনে পড়ল বালক একলব্যের কথা। তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন একলব্যের কাছে। দ্রোণাচার্যকে সামনে দেখতে পেয়ে একলব্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল। বিনীত ভাবে সে নিবেদন করল—"একদিন আপনি আমাকে শিষ্য করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু আমি আপনারই শিষ্য।"

দ্রোণাচার্য বললেন—"বেশ, তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।"

একলব্য বললে, "আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। আদেশ করুন আমাকে কি গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।" দ্রোণ বললেন, "তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি দাও।"

গুরুদেবের এই নিদারুণ আদেশে একলব্য বিস্মিত হল—কিন্তু স্থির চিত্তে বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে দ্রোণাচার্যের কাছে অর্পণ করল।

একলব্য পূর্বের মত আর অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রইল না। কিন্তু পুরুষকার, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে একলব্য-চরিত্র চিরকালের জন্য অদ্বিতীয় ও অবিনশ্বর হয়ে রইল।

কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্র পরীক্ষা

"তোমার সামনে ঐ গাছের উপর একটি পাখী আছে তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? আর ঐ পাখীর সঙ্গে আর কি দেখছ?"—প্রশ্ন করলেন দ্রোণাচার্য। রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যা কতদূর শিক্ষা হয়েছে তা পরীক্ষা করবার জন্য দ্রোণ আজ সকল কুমারদের সমবেত করেছেন। একটি গাছের উপর রেখেছেন কাঠের একটি পাখী। প্রথমে ডেকেছেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, ঐ পাখীটি দেখতে পাচ্ছি। আর ঐসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত গাছ এবং আপনাদেরও।"

আচার্য বিরক্ত হয়ে বললেন—"তুমি সরে যাও"।

তারপর ভীমকে ডাকলেন; ডাকলেন দুর্যোধন প্রভৃতি আরও কয়েকজনকে। কিন্তু সকলেই বললেন, "পাখীর সঙ্গে অন্য সব কিছু দেখছি।" আচার্য তাঁদের সরিয়ে দিয়ে এবার ডাকলেন অর্জুনকে। আচার্য বললেন—"ঐ পাখীটিকে লক্ষ্য করে শর সন্ধান কর।" অর্জুন প্রস্তুত হলে তিনি জিজ্ঞাসা

অর্জুন বললেন. "পাখীটার শুধু মাথা দেখতে পাচ্ছি।"

করলেন—"সামনে কি দেখছ অর্জুন?" অর্জুন উত্তর দিলেন, "একটা পাখী।" আচার্য তারপর জিজ্ঞাসা করলেন "আর কিছু দেখতে পাচ্ছ?" অর্জুন তার উত্তরে জানালেন, "কিছুই না।"

"পাখীটার সমস্ত শরীর দেখতে পাচ্ছ ?"

"না, পাখীটার শুধু মাথা দেখতে পাচ্ছি।"

আচার্য এবার খুশী হলেন; বললেন, "এবার বাণ ছোড়।" সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের বাণে পাখীটির মাথা কেটে মাটিতে পড়ে গেল। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, "আজ মনে হচ্ছে তুমি পারবে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে।"

দ্রোণাচার্য আর একদিন একটি অভিনব পরীক্ষা করলেন; সকল শিষ্যকে নিয়ে নদীতে নেমেছেন স্নান করতে। হঠাৎ গভীর জলে একটি কুমীর এসে আচার্যের হাঁটুর নীচে কামড় দিল। তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, "কুমীরটা মেরে আমাকে বাঁচাও।"

শিষ্যেরা পড়ল মহা বিপদে। জলের মধ্যে কুমীর; কুমীরকে মারতে গেলেই তো গুরুর দেহে আঘাত লাগবে। অন্য সকলে যখন কিছুই স্থির করতে পারছেন না, তখন অর্জুন এগিয়ে এলেন হাতে তীরধনু নিয়ে; জলের মধ্যে ছুঁড়লেন পাঁচটি বাণ। বাণের সাহায্যে অর্জুন কুমীরটিকে খণ্ড খণ্ড করে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিলেন। বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আচার্যদেব উঠে এলেন উপরে। প্রমাণ হল অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্রোণাচার্য খুবই খুশী হলেন। তিনি অর্জুনকে এই সময় 'ব্রহ্মশির' নামে একটি শক্তিশালী অস্ত্র দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য নির্দেশ দিলেন শুধু আত্মরক্ষার জন্যই এই অস্ত্র ব্যবহার করতে।

অর্জুন ছাড়া অন্যান্য রাজকুমারেরাও অনেক কিছু শিখেছেন। যুধিষ্ঠির কৃতবিদ্য হয়েছেন রথযুদ্ধে; দুর্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধে; নকুল, সহদেব প্রভৃতি হয়েছেন অসিযুদ্ধে।

কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্রনৈপুণ্য : কর্ণের অপমান

একদিন ভীষ্ম, কৃপাচার্য, বিদুর, ব্যাস প্রভৃতির সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র বসে আছেন। দ্রোণাচার্য এসে জানালেন রাজকুমারদের শিক্ষা সমাপ্ত। তাঁরা কতদূর কি শিখলেন সকলকে তিনি একবার তা দেখাতে চান।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রস্তুত হল বিরাট রঙ্গভূমি। মণিমুক্তা দিয়ে তা সাজান হল। তাতে ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিকে নিয়ে একটি মঞ্চের উপর বসলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। আর একটু দূরে বসলেন গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য পুরমহিলারা। বহু প্রজা এসেছেন দর্শক হয়ে। লোকে লোকারণ্য। রঙ্গভূমি আনন্দে মেতে উঠেছে। এমন সময় এলেন আচার্য দ্রোণ, সঙ্গে পুত্র অশ্বত্থামাকে নিয়ে। তারপর প্রবেশ করলেন কৌরব ও পাণ্ডবভ্রাতারা। সকলের আগে রয়েছেন যুধিষ্ঠির।

কুমারগণের অস্ত্রপরীক্ষা আরম্ভ হল। অসিযুদ্ধ, শরসন্ধান, অশ্বচালনা, নানারকমের খেলা দেখিয়ে কুমারগণ সকলকে মুগ্ধ করলেন; এরপর রঙ্গভূমিতে গদাহস্তে এগিয়ে এলেন দুর্যোধন ও ভীম। দর্শকরা কেউ দুর্যোধনের কেউ বা ভীমের পক্ষ নিয়ে

বাহবা দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্রোণাচার্য ঘোষণা করলেন, "এইবার অর্জুন তার অস্ত্রকৌশল দেখাবে।" অর্জুন তখন সোনার বর্ম পরে রঙ্গভূমিতে অগ্রসর হলেন। অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য দেখে সকলেই স্তম্ভিত। শুধু বাণের দ্বারাই তিনি কখনও অগ্নি জ্বালাচ্ছেন—কখনও করছেন মেঘের সৃষ্টি ; সেই মেঘ থেকে পড়ছে অবিরাম জলধারা—এ যেন মায়াবী সৃষ্টি করছেন মায়াজাল। কখনও বাণের দ্বারা নিজেকে ঢেকে ফেলছেন ; তারপরেই নিজেকে প্রকাশ করছেন অপরূপ গৌরবে। সব দেখে শুনে দর্শকরা একবাক্যে স্বীকার করল অর্জুনই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর।

ক্রীড়া সমাপ্তপ্রায়। দর্শকরা কেউ কেউ চলেও গেছেন। এমন সময় রঙ্গভূমিতে এলেন কর্ণ। তাঁর গায়ে রয়েছে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল। আচার্যদেবকে প্রণাম করে কর্ণ অনুমতি চাইলেন, অর্জুন যে সব কৌশল দেখিয়েছেন তিনিও সেগুলি দেখাতে চান। দ্রোণাচার্যের অনুমতি নিয়ে কর্ণ বহুক্ষণ ক্রীড়া-কৌশল দেখালেন। যাঁরা দেখলেন তাঁরা বললেন, কর্ণই বা কম কিসে ?

দুর্যোধন অর্জুনের সাফল্য দেখে এতক্ষণ ঈর্ষার আগুনে জ্বলেছেন। কর্ণকে পেয়ে মনের আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। কর্ণ উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আমি অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।"

কিন্তু কৃপাচার্য বাধা দিয়ে বললেন, "দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হলে

বংশ-পরিচয় দিতে হয়। এই যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। অর্জুন রাজার ছেলে—কুরুবংশে এর জন্ম। তুমি তোমার বংশ পরিচয় দাও। সেই পরিচয় না জেনে রাজকুমার অর্জুন কখনও তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারে না।"

এমন সময় অধিরথ প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন কর্ণের পিতা বলে। সকলে জানলেন কর্ণ সূতপুত্র। কর্ণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন দুর্যোধন এগিয়ে এসে বললেন, "বেশ, রাজা না হলে যদি অর্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চায়, তবে আমি এখনি কর্ণকে অঙ্গরাজরূপে অভিষিক্ত করছি।

দুর্যোধন কর্ণকে ঐ রঙ্গমঞ্চেই অঙ্গ-রাজ্যের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন। ভীমসেন বললেন, "কর্ণ রাজা হতে পারেন —কিন্তু সূতপুত্র। সূতপুত্র কখনই অর্জুনের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবার অধিকার পেতে পারে না।"

অপমানে ও ক্ষোভে কর্ণের ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। তিনি শুধু আকাশে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন—কারণ সূর্যই তাঁর ইষ্ট দেবতা। তারপর ভীমের কথার উত্তর দিতে গিয়ে দুর্যোধন বললেন—"ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার শক্তিতে, বীরগণের আর নদীগণের উৎপত্তির কথা সর্বদাই দুর্জ্ঞেয়।* কিন্তু জল থেকে যে অগ্নির উৎপত্তি তাই দিয়েই

* ক্ষত্রিয়াণাং বলং জ্যেষ্ঠং যোদ্ধব্যং ক্ষত্রবন্ধুনা।
শূরাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুর্বিদাঃ প্রভবাঃ কিল।

হয় ত্রিভুবন তপ্ত। দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে তৈরী হয়েছিল বজ্র। তা দিয়েই হয়েছে দানব সংহার।"

এই সব বাদানুবাদে অনেক সময় অতিবাহিত হল। সূর্য গেলেন অস্তাচলে। সূর্যাস্তের পর আর যুদ্ধ হয় না। কর্ণ পেলেন না অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে।

রঙ্গভূমি থেকে সবাই বিদায় নিলেন।

অর্জুনের গুরুদক্ষিণা

দ্রোণাচার্য একদিন সকল রাজপুত্রকে ডেকে বললেন,— "তোমাদের অস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদকে তোমরা বন্দী করে নিয়ে এস।"

রাজকুমারেরা আক্রমণ করলেন পাঞ্চালরাজ্য। প্রথমে যুদ্ধ করলেন দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ভাই। কিন্তু রাজা দ্রুপদ ছিলেন অমিত বলশালী। কৌরব রাজপুত্রগণ কিছুতেই তাঁর সাথে পেরে উঠলেন না। তারপর পাণ্ডবেরা অগ্রসর হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ হল। শেষে অর্জুনের কাছে দ্রুপদ পরাজিত হলেন। দ্রুপদকে বন্দী করে অর্জুন হাজির করলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। আচার্য দ্রোণের সেদিন কি আনন্দ! দ্রুপদের এবার দর্প চূর্ণ হয়েছে। দ্রোণাচার্য তাঁকে বললেন, "তুমি আমার বাল্যবন্ধু। আমি তোমাকে রাজ্যহীন করতে চাই না। রাজ্যের অর্ধেক তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হোক।"

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক

দিন যায়। রাজকুমাররা সকলেই এখন বড় হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দয়ায় প্রজারা সকলে মুগ্ধ। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের গুণগানে রাজধানী ও সমগ্র রাজ্য মুখরিত। কিন্তু দুর্যোধন এতে দুঃখিত। অন্ধ রাজাও যুধিষ্ঠিরের প্রশংসায় খুশী ছিলেন না। অভিমানী দুর্যোধন একদিন পিতাকে বললেন, —"রাজ্যের সকল প্রজা পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করছে। তারা চায় যুধিষ্ঠিরই যেন রাজা হয়। যুধিষ্ঠির যদি এখন রাজা পায় তবে পাণ্ডবদের সন্তানরাই পরে রাজা হবে—আমরা একশত ভাই চিরদিন থাকব তাদের অধীন হয়ে। এর একটা প্রতিবিধান করা দরকার।"

জতুগৃহ দাহ

একদিন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি সবাই মিলে পরামর্শ করলেন, পাণ্ডবদের গোপনে হত্যা করতে হবে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে ধরে বসলেন—কিছুদিনের জন্য পাণ্ডবদের বারণাবত নগরে যেন পাঠিয়ে দেন। তাহলে নিশ্চিন্ত মনে দুর্যোধন রাজা হতে পারবেন।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এ কথা ঠেলতে পারলেন না। পাণ্ডবদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বারণাবত নগরে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বারণাবত খুব রমণীয়

স্থান। তোমরা সেখানে কিছুদিন আনন্দ উৎসব করে এস।”

এদিকে দুর্যোধন সেখানে পাঠালেন তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী পুরোচনকে। পুরোচন জতু (শন, ধুনো, গালা, ঘৃত প্রভৃতি) দিয়ে একটি বাড়ী তৈরী করলেন পাণ্ডবদের জন্য। বাড়ীটি বাইরে দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু একটু আগুন ধরিয়ে দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাণ্ডবেরা পুড়ে মরবেন।

মহাত্মা বিদুর ছিলেন পাণ্ডবদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করে দিলেন। পাণ্ডবেরা বারণাবতে পা দিয়েই দুর্যোধনের এই মতলবের কথা বুঝতে পারলেন। তাঁরা মাতা কুন্তীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন অতি সাবধানে। পাণ্ডবেরা ইতিমধ্যে একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করেছিলেন। তাঁরা একদিন গভীর রাত্রে নিজেরাই জতুগৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাকে নিয়ে ঐ গোপন সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে গেলেন। একজন নিষাদরমণী তাঁর পাঁচটি পুত্র নিয়ে ঘুমিয়েছিল ঐ জতুগৃহে। তারা ঐ আগুনে পুড়ে মরল। সকালবেলায় বারণাবতের অধিবাসীরা ঐ মৃতদেহগুলি দেখে মনে করল কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবেরা পুড়ে মরেছেন। চোখের জলে ভিজে তারা হস্তিনাপুরে ঐ দুঃসংবাদ নিয়ে গেল। দুষ্ট পুরোচনও সেদিন ঐ জতুগৃহে ছিল। তাকেও প্রাণ হারাতে হয়েছিল ঐ দিন।

বকরাক্ষস বধ

পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গ পথে গঙ্গার ধারে এলেন। বিদুরের লোক যন্ত্রচালিত এক নৌকা নিয়ে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল গঙ্গায়। সেই নৌকায় চড়ে পাণ্ডবেরা চলে গেলেন গঙ্গার অপর পারে।

শ্রান্ত ক্লান্ত পাণ্ডবেরা চলেছেন নির্জন পথ দিয়ে। লোকালয়ের কোন চিহ্ন নেই। পানীয় জল পাওয়া যায় না; খাদ্য তো দূরের কথা। অনাহারে অনিদ্রায় তাঁদের দিন কাটছে অতি কষ্টে।

ক্রমে তাঁরা প্রবেশ করলেন এক বনের মধ্যে। সে বনে বাস করত হিড়িম্ব রাক্ষস। মানুষের গন্ধ পেয়ে সে ত খুব খুশী। নরমাংস সে অনেকদিন খায়নি। তাই বোন হিড়িম্বাকে পাঠাল মানুষ কয়েকটা ধরে আনতে। কিন্তু হিড়িম্বা এসে কোথায় মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে যাবে—তা নয় সে মুগ্ধ হল ভীমকে দেখে। ভীমকে সে বিয়ে করতে চায়। কুন্তী দেবীর কাছে সে এই প্রার্থনা জানাল।

বোনের আসতে দেরী দেখে হিড়িম্ব নিজেই ছুটে এল। কিন্তু ভীমের কয়েকটা আছাড় খেয়ে বেচারী হিড়িম্ব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল।

তারপর মায়ের আদেশে ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করলেন। তাঁদের এক বলশালী পুত্র হয়েছিল—নাম ঘটোৎকচ।

বনে বনে ঘুরে পাণ্ডবেরা ক্লান্ত। বিদুর আবার খবর

পাঠালেন—তাঁরা যেন একচক্রা গ্রামে যান। পাণ্ডবেরা সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হলেন। কিন্তু ছদ্মবেশে। ব্রাহ্মণের বেশে দিনের বেলায় তাঁরা ভিক্ষা করেন। ভিক্ষাই এখন রাজপুত্রদের অবলম্বন। ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় তার অর্ধেক লাগে ভীমসেনের। বাকী অর্ধেক চার ভাই ও মা ভাগ করে খান।

একচক্রার অদূরে বাস করত বকরাক্ষস। তার ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। গ্রামবাসীরা সকলে মিলে তার সঙ্গে চুক্তি করেছে—প্রতিদিন এক এক জনকে প্রচুর খাবার (অন্ততঃ ন মণ চালের ভাত) আর একজন মানুষ দিতে হবে তার খাদ্য হিসাবে।

পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণেরও একদিন পালা এল। ন মণ চালের ভাত, আর অনেক মিষ্টি তারা সংগ্রহ করেছে। কিন্তু কে যাবে এই সকলের সঙ্গে বকবাক্ষসের মুখের গ্রাস হয়ে। ব্রাহ্মণ নিজেই যেতে চাইছেন—আর তাই নিয়ে বাড়ীতে কান্নার রোল উঠেছে। সমস্ত শুনে কুন্তীদেবী বললেন, "আমি আমার পাঁচ ছেলের একটিকে পাঠাব। আপনাদের কোন ভয় নেই। আর আমার এই ছেলেকে রাক্ষস কিছুই করতে পারবে না।"

মায়ের আদেশে ভীম সমস্ত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বকরাক্ষসের গুহার দিকে চললেন। তার গুহার কাছাকাছি এসে ভীম নিজেই সেই সব খাবার খেতে লাগলেন। গুহা থেকে

বেরিয়ে রাক্ষস দেখল একজন মানুষ তার সব খাবার খেয়ে নিচ্ছে। সে রেগে আগুন। খুব হৈচৈ করে সে ভীমের পিঠে দমাদম কিল ঘুষি মারতে লাগল। ভীমের তাতে কি? খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভীম ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ালেন; তারপর রাক্ষসকে মাটিতে কয়েকটা আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

একচক্রার সকল লোকে ভীমকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই গ্রামে বাস করার সময়েই পাণ্ডবেরা শুনতে পেলেন পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেছেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগদানের জন্য পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্চাল রওনা হলেন। পথে অর্জুন চিত্ররথ গন্ধর্বকে পরাজিত করে 'চাক্ষুষী' বিদ্যা লাভ করলেন। এই বিদ্যাবলে অর্জুন ইচ্ছা করলেই তিন লোকের সব কিছু দেখতে পারবেন। তারপর তাঁরা পাঞ্চালদেশে পৌঁছে এক কুম্ভকারের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তখনও পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের বেশে রয়েছেন এবং ভিক্ষা করেই তাঁদের দিন চলছে।

স্বয়ম্বর সভায় যোগদানের জন্য দেশ বিদেশ থেকে অনেক রাজা এসে পৌঁছুতে লাগলেন। রাজা দ্রুপদ ঘোষণা করেছেন

দ্রৌপদীকে লাভ করতে হলে ধনুর্বিদ্যায় পরীক্ষা দিতে হবে। এজন্য তিনি একটি ধনু প্রস্তুত করেছেন। একটি চক্রাকার যন্ত্র অবিরাম ঘুরছে। তার উপর রয়েছে একটি লক্ষ্য বস্তু। এই ধনু দিয়ে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন তাঁকেই তিনি কন্যা দ্রৌপদীকে সম্প্রদান করবেন।

দ্রৌপদী প্রবেশ করলেন স্বয়ম্বর সভায়। তাঁকে সামনে রেখে ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন লক্ষ্যভেদ করার জন্য সমবেত রাজাদের আহ্বান করলেন। এই সভায় বিভিন্ন দেশের রাজারা ত উপস্থিত ছিলেনই; তাছাড়া ছিলেন অনেক দেবতা ও ঋষি। স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরামও এসেছিলেন স্বয়ম্বর সভায়। ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবদের কৃষ্ণ চিনে ফেললেন। একে একে রাজারা লক্ষ্যভেদ করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু ধনুখানিতে শরসংযোগ করতেই অনেকে পারলেন না। কারুর গলার হার গেল খুলে, কারুর মাথা থেকে মুকুট পড়ল খসে। এর পর সিংহবিক্রমে কর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে যাবেন এমন সময় দৃঢ়কণ্ঠে দ্রৌপদী জানালেন, "সূত-পুত্রকে আমি পতিত্বে বরণ করব না।" হাতের ধনু হাতেই রইল। অপমানে কাঁপতে কাঁপতে কর্ণ অংশুমালীর দিকে তাকালেন। তারপর ম্লান হাসি হেসে করলেন ধনুত্যাগ।

মহাবীর দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, জরাসন্ধ, মদ্ররাজ শল্য লক্ষ্য-ভেদের চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না কেউ। রাজারা যখন অসমর্থ হলেন তখন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে এক তেজোময়

পুরুষ উঠলেন। ব্রাহ্মণেরা অনেক বাধা দিলেন—কিন্তু তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন লক্ষ্যভেদ করার জন্য। সকলেই অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, এই পুরুষসিংহই বোধ হয় লাভ করবেন রাজকন্যা দ্রৌপদীকে। ৮

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

অর্জুন মনে মনে প্রণাম করলেন আচার্যকে, মহাদেবকে

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

আর সভায় উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে। তারপর শর যোজনা করালেন—লক্ষ্য বিদ্ধ হয়ে ভূমিতে পড়ল। সভায় তুমুল

আনন্দ কোলাহল উঠল। দেবতারা করলেন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। দ্রৌপদী অর্জুনের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন।

একজন ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীকে জয় করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ক্ষত্রিয়রাজারা খুবই অপমানিত বোধ করলেন। তারা সকলে মিলে আক্রমণ করলেন রাজা দ্রুপদকে। অর্জুন তখন তাঁর ধনু নিয়ে এগিয়ে এলেন দ্রুপদকে বাঁচাতে। ভীম একটা গোটা গাছ তুলে নিয়ে তাই দিয়েই রাজাদের আক্রমণ করলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি সকলে মিলেও কিছু করতে পারলেন না। তখন কৃষ্ণ এগিয়ে এসে বললেন, "ধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ লাভ করেছেন দ্রৌপদীকে। আপনারা সকলে শান্ত হোন।" কৃষ্ণের কথায় তখন সকলে শান্ত হলেন।

পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মা কুন্তী যেখানে ছিলেন। তখন রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। কুটিরের বাইরে থেকেই তাঁরা সোল্লাসে বললেন—"মা দেখ, আমরা কি ভিক্ষা এনেছি।" মা কুটিরের মধ্যে ছিলেন; সেখান থেকেই বললেন—"যা এনেছ পাঁচ ভাইতে ভাগ করে নাও।" কুন্তীদেবী অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলেন; ভিক্ষা সামান্য বস্তু নয়—এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। কিন্তু তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। দ্রৌপদীকে বিবাহ করার জন্য তিনি তাঁর পাঁচ ছেলেকে আদেশ করলেন। পাঁচ ভাই এতে সম্মতিও জানালেন।

এদিকে দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে এসে জেনে গেলেন ব্রাহ্মণদের পরিচয়। ধনুর্ধর ব্রাহ্মণ অর্জুন ছাড়া আর কেউ নয়। একথা জেনে রাজা দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণ-বলরামও সাক্ষাৎ করলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। রাজা দ্রুপদ কুন্তীদেবী এবং দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের নিয়ে গেলেন নিজ রাজধানীতে।

কুন্তীদেবীর আদেশ রক্ষার জন্য পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হল। পাঁচদিন ধরে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল বিবাহ উৎসব।

পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আনয়ন

বিদুরই প্রথম সংবাদটা দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। পাণ্ডবেরা জতুগৃহে পুড়ে মরেননি। তাঁরা বেঁচে আছেন। ব্রাহ্মণবেশে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জয় করে এনেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ খবর পেয়ে খুশী হলেন। তিনি আদেশ করলেন শীঘ্র কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে সসম্মানে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনতে।

দুর্যোধন শুনে খুবই রেগে গেলেন। তিনি পিতাকে পরামর্শ দিলেন, "জ্ঞাতিশত্রুকে এভাবে কখনও বাড়তে দেবেন না।" কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনের কথায় সায় দিলেন। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং বিদুর কিন্তু তাতে বাধা দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের রাজধানীতে আনাই

স্থির করলেন এবং সেজন্য বিদুরকে পাঠালেন। বিদুর বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার ও রথ নিয়ে চললেন পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিদুরের সঙ্গে চললেন।

দ্রুপদের কাছে বিদুর প্রস্তাব করলেন দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এই প্রস্তাবে দ্রুপদ রাজী হলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে পাঠালেন পথ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনা করে নিয়ে আসতে।

পাণ্ডবেরা নগরে প্রবেশ করে পূজনীয়দের প্রথমেই প্রণাম করলেন। কুললক্ষ্মী দ্রৌপদীকে যথারীতি বরণ করে ঘরে তুলে নিলেন কৌরব জননী গান্ধারী।

ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ

পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে কিছুদিন সুখেই কাটল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দুইভাগে ভাগ করে একভাগ দিলেন পাণ্ডবদের। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে এক নূতন নগরীর পত্তন করলেন। তার নাম হল ইন্দ্রপ্রস্থ। সেখানে বহু বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জ্ঞানী, গুণী এসে বাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থ সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে হস্তিনাকে ছাড়িয়ে গেল।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবেরা সুখে রাজত্ব করছেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কথা ছিল দ্রৌপদীর সংগে এক ভাই যখন কথা বলবেন, সেই ঘরে আর কোন ভাই ঢুকবেন না। ঢুকলে বার বছর

বনবাসে যেতে হবে। হঠাৎ একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনকে জানালেন, চোর তার গরুগুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। অসহায় ব্রাহ্মণ এই বিপদে তৃতীয় পাণ্ডবের সাহায্য চান অর্জুন তাড়াতাড়ি অস্ত্রগৃহে প্রবেশ করলেন। অস্ত্র নিয়ে যখন ফিরে আসছেন তখন দেখলেন দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির সেই ঘরে কথা বলছেন।

ব্রাহ্মণকে বিপদ থেকে রক্ষা করে অর্জুন ফিরে এলেন ফিরে এসেই তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি চাইলেন বনবাসে যাওয়ার। যুধিষ্ঠির বাধা দিলেন, "ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার জন্য তোমার এই নিয়মভঙ্গ। এতে তোমার কোন অপরাধ হয়নি তোমাকে বনবাসে যেতে হবে না।"

অর্জুন বললেন, "ধর্মের নামে ছলনা করতে নেই—একথা আপনার কাছেই শুনেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি সত্য থেকে আমি বিচলিত হব না।"* এই বলে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুন বার বছরের জন্য বনবাসে চলে গেলেন।

অর্জুনের বনবাস

অর্জুনের বনবাস আরম্ভ হল। প্রথমে তিনি গঙ্গাতীর ধরে পূর্বদিকে চললেন। কত দেশ, কত তীর্থ, কত বন জঙ্গল

* ন ব্যাজেন চরেদ্ ধর্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম
ন সত্যাৎ বিচলিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥

অতিক্রম করে তিনি উপস্থিত হলেন পূর্ব সীমান্ত মণিপুরে। সেখানে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সংগে তাঁর বিবাহ হল। নাগকন্যা উলুপির সঙ্গেও অর্জুনের বিবাহ হয়েছিল এই বনবাস কালে। তারপর উত্তর ভারতের সমস্ত জায়গা ভ্রমণ করে তিনি উপস্থিত হন প্রভাস তীর্থে। সেখানে দেখা হল সখা কৃষ্ণের সঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। রৈবতক পর্বতে তখন যদুবংশীয়দের এক পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনও সেই উৎসবে যোগ দিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হন। তখনকার দিনে বাহুবলে কন্যাহরণ ক্ষত্রিয়-বিবাহের একটি রীতি ছিল। অর্জুনও বাহুবলে সুভদ্রাকে হরণ করে রথে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন। এতে যদুবংশীয় বীরগণ অপমানিত বোধ করলেন। তাঁরা চাইলেন অর্জুনের সংগে যুদ্ধ করতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং অর্জুন ও সুভদ্রাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠান করলেন।

অর্জুনের বার বছর বনবাস পূর্ণ হল। সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। সুভদ্রা ও অর্জুনের যে পুত্র হল তাঁরই নাম বীর অভিমন্যু। দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের নাম হল— প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

খাণ্ডব দাহন

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একদিন যমুনাতীরে ভ্রমণ করছেন। এমন সময় এক জটাধারী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, "আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ। আমাকে একটি বার খাইয়ে তৃপ্ত করুন।"

কৃষ্ণ ও অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, আপনি কি খেতে চান।" ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি অগ্নি। শ্বেতকি রাজা বার বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের ঘি খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়েছে। আমার এখন মাংস খাওয়ার অভিলাষ। তাই খাণ্ডব বনটি পুড়িয়ে তার জীবজন্তু গুলিকে খেতে চাই। অনেকবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ইন্দ্র এই বনটিকে রক্ষা করছেন। কারণ ইন্দ্রের সখা তক্ষক বাস করে এই বনে।" শুনে কৃষ্ণার্জুন বললেন, "আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র তো এখানে নেই।"

অগ্নি তখন অর্জুনকে দিলেন প্রসিদ্ধ ধনু গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর এবং কপিধ্বজ রথ ; কৃষ্ণকে দিলেন চক্র ও গদা।

তারপর অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে খাণ্ডব দহন করতে লাগলেন। কৃষ্ণার্জুন তাঁকে সাহায্য করলেন। একটিও প্রাণী বাইরে যেতে পারল না। ইন্দ্র বাধা দিতে এলেন ; আরম্ভ করলেন বর্ষণ। অগ্নি নিলেন সে জল শুষে। তখন মেঘ দিয়ে আকাশ ঢেকে দিতে চাইলেন ইন্দ্র। কিন্তু

অর্জুন নীচ থেকে তীর ছুঁড়ে খাণ্ডব বনকে একেবারে ঢেকে ফেললেন।

কৃষ্ণার্জুনের বীরত্ব দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। তিনি আর বাধা দিলেন না। পনের দিন অগ্নি মনের সুখে খাণ্ডব বন দগ্ধ করলেন। অসংখ্য প্রাণী পুড়ে মরল। বাঁচল মাত্র ছয়টি। তাদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী ময়দানব। ময়দানব অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন। তাই অগ্নি তাকে আর পুড়িয়ে খেতে পারলেন না।

অসংখ্য পশুপক্ষীর মাংস খেয়ে অগ্নি পরিতৃপ্ত হলেন। অগ্নিকে তুষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন চলে এলেন যমুনার তীরে। সঙ্গে এলেন আশ্রিত ময়দানব।

সভা পর্ব

ময়দানব

কৃষ্ণার্জুন ময়দানবের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাই পরম কৃতজ্ঞতায় কৃষ্ণের কাছে জানতে চাইল কি কাজ সে তাঁদের জন্য করতে পারে। ময়দানব ছিল দানবদের বিশ্বকর্মা। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, "পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী নির্মাণ করেছেন। তুমি তাতে এমন একটি সভাগৃহ তৈরী কর যা মানুষ কখনো তৈরী করেনি।"

কৃষ্ণ চলে গেলেন দ্বারকায়। ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ করতে লাগল। বহুদিন আগে সে দানবদের যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিল। সেগুলি তখনও ছিল মৈনাক পর্বতের বিন্দু সরোবর তীরে। ময়দানব সেখান থেকে সংগ্রহ করল সভানির্মাণের জন্য প্রচুর মণিরত্ন এবং স্ফটিক। এই সঙ্গে সে নিয়ে এল ভীমের জন্য বৃষপর্বার সোনার গদা এবং অর্জুনের জন্য বরুণের শঙ্খ দেবদত্ত। স্ফটিক ও মণিমুক্তা দিয়ে ময়দানব যে সভাগৃহ রচনা করল— তিন লোকে তার তুলনা নেই। সভাগৃহের মধ্যেই সোনার গাছ এবং সোনার পদ্মে ভরা দীঘি। জলের মধ্যে ভাসছে কুমীর ও মাছ। তাও সোনা দিয়ে তৈরী। স্ফটিক দিয়ে তৈরী হয়েছে স্তম্ভ আর সিঁড়িগুলি।

নানাদেশ থেকে রাজা ও মুনিঋষিরা এসে এই প্রাসাদ

দেখে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। একদিন দেবর্ষি নারদও উপস্থিত হলেন ময়দানব নির্মিত এই সভাগৃহে।

জরাসন্ধ বধ

দেবর্ষি নারদ স্বর্গেই শুনেছিলেন এই সভাগৃহের কথা। তিনি সভাগৃহ দেখে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করলেন এবং বললেন, "রাজসূয় যজ্ঞ করার মতই এই সভাগৃহ। স্বর্গে তোমার পিতা পাণ্ডুও বলেছিলেন, তুমি একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার বলে তিনি ইন্দ্রের সভায় কত সুখে ও সম্মানের সঙ্গে বাস করছেন।"

ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব একথা শুনে খুবই উল্লসিত। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ সামান্য ব্যাপার নয়। পৃথিবীর সকল রাজাকে বশ করতে না পারলে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। যুধিষ্ঠির তাই চিন্তিত হলেন এবং পরামর্শের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন, "রাজসূয় যজ্ঞের যোগ্য অধিকারী আপনি। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে। মগধের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ; যার সহায়—মহাবীর শিশুপাল। আগে তাকে বধ করা দরকার। কেননা জরাসন্ধ অত্যন্ত অত্যাচারী। ছিয়াশি জন রাজাকে সে ইতিমধ্যে বন্দী করে রেখেছে তার রাজধানী গিরিব্রজে।

বন্দী রাজার সংখ্যা একশত পূরণ হলে সে রুদ্রদেবতার কাছে তাদের সকলকে বলি দেবে। অন্যলোক দূরের কথা, দাদা বলরাম ও আমি তার ভয়ে মথুরা থেকে দ্বারকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছি। রাজসূয় যজ্ঞ যদি আপনাকে করতে হয় তবে আপনার কর্তব্য হবে ঐ বন্দী রাজাদের আগে মুক্তি দেওয়া। সেজন্য প্রয়োজন জরাসন্ধকে বধ করা।"

জরাসন্ধকে বধ করা সম্ভব হবে কি?—রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন এবং স্থির করলেন দরকার নেই এই রাজসূয় যজ্ঞে।

যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে ভীম ভীষণ চটে গেলেন; বললেন—"রাজা হয়ে এরকম কথা বলা আপনার শোভা পায় না। কৃষ্ণের বুদ্ধি, আমার বল এবং অর্জুনের সাহস একসংগে মিলিত হলে জরাসন্ধ বধ অবশ্যই সম্ভব হবে।" অর্জুন বললেন, "আমার ধনুর্বাণ বা বলবীর্য যদি জরাসন্ধকে বধ করতে বা বন্দী রাজাদের রক্ষা করতে না পারে, তবে কি হবে আমার এসব দিয়ে? যদি শুধু শান্তিই কাম্য হয় তবে বনে যাওয়াই ভাল। এখন আমাদের সাম্রাজ্য লাভ করতে হবে—শত্রুর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব।" ভীম ও অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ খুশী হলেন; এবং যুধিষ্ঠির ও তাঁর মতের পরিবর্তন করলেন। মগধের রাজধানী গিরিব্রজে তিনজন যাত্রা করলেন—শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন;—উদ্দেশ্য জরাসন্ধকে বধ করা।

রাজধানীতে এঁরা প্রবেশ করলেন ব্রতধারীর বেশে।

পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে জরাসন্ধ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু জরাসন্ধকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—"আমরা ধর্মরক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তুমি রুদ্রদেবের কাছে বলি দেওয়ার জন্য নির্দোষ রাজাদের বন্দী করে রেখেছ। এখন এইসব রাজাকে এক্ষুণি মুক্তি দাও, নতুবা যুদ্ধ করে যমালয়ে যাও।"

জরাসন্ধ বন্দী রাজাদের মুক্তি দিতে নারাজ। কাজেই ভীমের সঙ্গে আরম্ভ হলো মল্লযুদ্ধ। চৌদ্দ দিন যুদ্ধ চলল। জরাসন্ধ শ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল। এমন সময় ভীম তাকে আক্রমণ করলেন ভীমবেগে। কিন্তু কিছুতেই তিনি জরাসন্ধকে বধ করতে পারছেন না। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন—পা ধরে টেনে জরাসন্ধের শরীরটাকে দুভাগে ভাগ করে দিতে; যেন একটা তৃণকে দুভাগে ভাগ করে দেওয়া। জরাসন্ধ যখন জন্মেছিল, তখন তার শরীর ছিল দুটি ভাগে পৃথক করা। জরা রাক্ষসী সেই দুটি ভাগ একসংগে যুক্ত করেছিল, তাই নাম জরাসন্ধ। ভীম দুটি পা ধরে টান মারলেন; সঙ্গে সঙ্গে জরাসন্ধের শরীর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। জরাসন্ধ হল নিহত। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রকে রাজা করে দিলেন এবং মুক্ত করলেন বন্দী রাজাদের। মুক্তি পেয়ে রাজারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীকৃষ্ণকে, "আমরা আপনাদের কি উপকারে আসতে পারি?" শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, "আপনাদের কাছে কিছুই চাই না; তবে যুধিষ্ঠির

রাজসূয় যজ্ঞ করছেন। তাতে আপনারা সকলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন।"

পরম আনন্দে রাজারা সে কথায় স্বীকৃত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ চললেন দ্বারকায়। ভীম ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এসে জানালেন জরাসন্ধ বধের কথা। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে কর আদায়ের জন্য চার ভাই চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন। ধনরাজ কুবের থাকেন উত্তরে—উত্তর দিকে বেরুলেন অর্জুন। পূবদিকে গেলেন ভীম; দক্ষিণে সহদেব ও পশ্চিমে নকুল। সবদিকের রাজাদের বশীভূত করে চার ভাই প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এলেন। এবার তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"এখন আয়োজন করুন রাজসূয় যজ্ঞের।"

রাজসূয় যজ্ঞ

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। দেশবিদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের এবং রাজাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। নকুল নিজে হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি পূজনীয় গুরুজনদের এবং কৌরব ভাইদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এলেন। দূর-দূরান্ত থেকে রাজারা এসে সমবেত হলেন। এলেন গান্ধাররাজ সুবল ও তাঁর পুত্র শকুনি, এলেন মদ্ররাজ শল্য এবং সপুত্র দ্রুপদ। মহাবল চেদিরাজ শিশুপালও এসে উপস্থিত হলেন যজ্ঞশালায়। গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে এবং তাঁদের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

যজ্ঞকার্যে যুধিষ্ঠির সকলের সহায়তা প্রার্থনা করে কর্মবিভাগ করলেন। বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ ভীষ্ম রইলেন সকলের উপরে। ভোজন ব্যাপারের পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন দুঃশাসন, অশ্বত্থামা নিলেন ব্রাহ্মণদের পরিচর্যার ভার; মহামতি সঞ্জয়ের উপর রইল রাজাদের অভ্যর্থনা। কৃপাচার্য নিযুক্ত হলেন ধনরত্ন রক্ষায়; উপহার গ্রহণের ভার দুর্যোধনের। প্রার্থীদের দান করবেন কর্ণ। আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে চেয়ে নিলেন ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেবার কাজ। অভিজ্ঞ ও মন্ত্রবিশারদ হোতারা হোমকর্ম সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ দেখে তৃপ্তিলাভ করলেন সমাগত মহর্ষিরা এবং যজ্ঞের দেবতারা।

যজ্ঞ সম্পন্ন হবার পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"এবার সমবেত সকলের মধ্যে যিনি বরিষ্ঠ তাঁকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি প্রদান কর।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, "পিতামহ! কাকে আপনি সকলের মধ্যে বড় মনে করেন?" শান্তনু-নন্দন উত্তরে বললেন—"এই সভায় তেজ, বল, পরাক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আমাদের পূজ্যতম।" যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বোত্তম অর্ঘ্যটি প্রদান করলেন।

কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমে তিনি ভীষ্মকে খুব গালমন্দ দিয়ে তারপর কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন। নানা কটূক্তি করে শেষে কয়েকজন রাজাকে

নিয়ে শিশুপাল একটা হৈ চৈ করতে চাইলেন। ভীম তার সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে আলিঙ্গন করে মধুর বাক্যে শান্ত করলেন। শিশুপাল তখন উপহাস করে বলল—"ভীষ্ম! তুমি ভীমকে ছেড়ে দাও। রাজারা সকলে দেখুক, পতঙ্গ যেমন আগুনে দগ্ধ হয় ভীম তেমন আমার প্রভাব অগ্নিতে ভস্মীভূত হোক।" ভীষ্ম বললেন—"না, ভীম নয়, তুমি যার এত নিন্দা করছ সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি এবার বলতে লাগলেন—"এই অত্যাচারী শিশুপাল বহুদিন থেকে বহুভাবে অন্যায় করে আসছে। আমি এর জননীকে কথা দিয়েছিলাম একশত অপরাধ ক্ষমা করব। আজ শিশুপালের অপরাধ একশতকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং আজ সকলের সামনে একে যোগ্য শাস্তি দিতে হবে।" এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ তার শাণিত চক্র দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। শিশুপালের দেহ থেকে এক অদ্ভুত তেজ বেরিয়ে এসে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করল এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই মিলিয়ে গেল।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল। কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চললেন দ্বারকায়। যাওয়ার পূর্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ! আপনি সর্বদা অপ্রমত্ত থেকে প্রজাপালন করুন। জীবগণ মেঘকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ

করে ; পাখীরা অবলম্বন করে বৃক্ষকে আর দেবগণ আশ্রয় করেন ইন্দ্রকে। তেমনি বন্ধুজনেরা যেন আপনাকে আশ্রয় করে সুখে জীবন যাপন করতে পারে।"*

দ্যূতক্রীড়া

সকলে চলে গেলেও শকুনি, দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবেরা কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের নূতন প্রাসাদ তাঁরা যতই দেখেন, তত মুগ্ধ হন। দুর্যোধন মনে মনে ভাবেন, কি করে পাণ্ডবেরা এমন সুন্দর পুরী নির্মাণ করল! এরূপ আশ্চর্য পুরী আর ত দেখা যায় না। অপরূপ এর নির্মাণ কৌশল। স্ফটিকের তৈরী স্থলকে মনে হয় জলের মতো, আবার জলকে দেখে মনে হয় স্থল। কখনও দুর্যোধন স্ফটিকের জলাধার দেখে পরিধেয় বস্ত্র সামলাচ্ছেন অথচ সেখানে এক ফোঁটাও জল নেই। আবার কখনও স্থল ভেবে হেঁটে চলেছেন, হঠাৎ পড়ে গেলেন জলের মধ্যে। দুর্যোধনের কাপড় চোপড় সব ভিজে গেল। ভীম ত হেসে খুন! আড়াল থেকে পরিচারকেরা হেসে লুটোপুটি। কখনও বা উন্মুক্ত দরজা দেখে দুর্যোধন ঘরের বাইরে যাচ্ছেন কিন্তু স্ফটিকের স্তম্ভে ধাক্কা খেলেন। আবার কখনও বা স্ফটিক স্তম্ভ ভেবে

* অপ্রমত্তো স্থিতো নিত্যং প্রজাঃ পাহি বিশাংপতে
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ॥

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজছেন। দুর্যোধন নানাভাবে লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে হস্তিনায় ফিরে গেলেন।

ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে লাগল দুর্যোধনের অন্তর; শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হল। মামা শকুনিকে অভিমান-ভরে একদিন তিনি বলেই ফেললেন, "এ প্রাণ রাখার আর কোন অর্থ হয় না। এবার বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবদের এত ঐশ্বর্য ও সম্পদ আমি সহ্য করতে পারছি না।"

শকুনি অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং অন্ধরাজাকে জানালেন সব কথা। ধৃতরাষ্ট্র প্রতিবিধানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শকুনি ও কর্ণ তখন প্রস্তাব করলেন, দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে তার সকল ধনরত্ন কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইলেন বিদুরের সঙ্গে। বিদুর বললেন—"দ্যূতক্রীড়ার মত অধর্ম নেই। তাছাড়া এই দ্যূতক্রীড়া পাণ্ডব ও আপনার পুত্রদের মধ্যে সর্বনাশা বিবাদের সৃষ্টি করবে।"

কিন্তু এদিকে দুর্যোধন জানালেন যদি দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাব গৃহীত না হয় তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাধ্য হয়ে আদেশ দিলেন দ্যূতক্রীড়ার। তার জন্য হস্তিনায় ইন্দ্রপ্রস্থের অনুরূপ একটি মণিময় সভাগৃহ তৈরী হল। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করলেন দ্যূতক্রীড়ার জন্য।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ক্রীড়ায় অত্যন্ত ঝগড়া হয়। আপনি কি মনে করেন এতে আমাদের যোগদান করা উচিত?" বিদুর বললেন—"দ্যূতক্রীড়া যে বহু অনর্থের মূল তা আমি জানি। তাই আমি নিবারণের চেষ্টাও করেছি অনেক; কিন্তু পারিনি। তুমি বিদ্বান; যা ভাল মনে হয় তাই কর।"

পাশা খেলার জন্য শকুনি হস্তিনায় উপস্থিত আছেন—যুধিষ্ঠির এ কথা জানলেন; বুঝতেও পারলেন মাতুলের দুরভিসন্ধির কথা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত। তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অধর্ম। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে উপস্থিত হলেন হস্তিনায়।

যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্রের নতুন সভাগৃহে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হল। সভায় উপস্থিত রয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ প্রবীণেরা আর কর্ণসহ কুরুভ্রাতাগণ।

দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে মাতুল শকুনি খেলতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে বাজী রাখলেন একটি মণিময় হার এবং সহস্র মুদ্রা। শকুনি সে সব জয় করে নিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখলেন সহস্র দাসী ও সহস্র ভৃত্য। এবারও যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। ধীরে ধীরে ঘোড়া, হাতী, রথ যুধিষ্ঠির যাই বাজী রাখেন, শকুনি কপট পাশায় তা জয় করে নেন। যুধিষ্ঠিরের

পরাজয় দেখে বিদুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—"মহারাজ, এতে আপনার কখনই মঙ্গল হবে না। মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি থাকে না, আমার কথাও আপনার ভাল লাগবে না। তবু আমি বলছি, আপনি বুঝতে পারছেন না, চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন। আমার প্রার্থনা আপনি নিজের ও বংশের কল্যাণের জন্য কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন; পাণ্ডবদের ক্ষেপিয়ে কৌরব বংশের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।"

দুর্যোধন গর্জন করে উঠলেন—"আপনার উপদেশ শোনার মত আমাদের সময় নেই। আপনার যদি ভাল না লাগে তবে

কুরু পাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়া

যে দিকে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন।” বিদুর অনেক কথা বললেন এর উত্তরে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র নীরব রইলেন। খেলা চলতে লাগল। যুধিষ্ঠির পণ রাখেন আর শকুনি তা জয় করে নেন। এই ভাবে যুধিষ্ঠিরের সকল ধনরত্ন গেল; গেল সকল ভূ-সম্পত্তি। তারপর তিনি একের পর এক পণ রাখলেন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে। তাতে হেরে গিয়ে শেষে পণ রাখলেন নিজেকে। এবারও যখন যুধিষ্ঠির পরাজিত হলেন তখন শকুনি ও কর্ণ হেসে বললেন—“মহারাজ! আর তো আপনার বাকী রইল দ্রৌপদী। এবার তাঁকে পণ রাখুন।” যুধিষ্ঠির তখন বুদ্ধিহারা—পণ রাখলেন দ্রৌপদীকে। সভায় উপস্থিত সকলে ধিক ধিক করে উঠলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সকলে বসে রইলেন মাথা নীচু করে। সহসা বিকট চিৎকারে শকুনি ঘোষণা করলেন—“এইবার দ্রৌপদীকে আমরা জয় করে নিলুম।”

দ্রৌপদীর অপমান

দুর্যোধনের আদেশে তখনই এক সারথি গেল দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় নিয়ে আসতে। তিনি সারথিকে কঠোর ভাষায় জানালেন—“তুমি সভায় গিয়ে জেনে এস, রাজা যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে পণ রেখেছিলেন না আমাকে? আমাকে যদি আগে পণ রেখে থাকেন তবেই আমার যাবার কথা। নতুবা আমি রাজসভায় যাব না।”

সারথি ফিরে এল। অহংকারী দুর্যোধন এবার পাঠালেন দুঃশাসনকে। দুঃশাসন কেশ আকর্ষণ করে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এলেন। অপমানিতা দ্রৌপদী সভার সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "রাজাদের ধর্ম কি লোপ পেয়েছে? এই সভায় উপস্থিত সবাই কি করে এমন অধর্ম সহ্য করছেন? ভীষ্ম এবং দ্রোণ কি জীবিত না মৃত? ছলনার দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জয় করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি প্রথমে নিজেকে পণ রেখেছিলেন। তারপর পণ রেখেছেন আমাকে। আমার জিজ্ঞাস্য আমাকে কৌরবেরা জয় করলেন কিরূপে? তা যদি না হয় তবে আমি কুলবধূ; প্রকাশ্য রাজসভায় আমাকে কেন এরা অপমানিত করছে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই নীরব। শুধু দ্রৌপদীকে সমর্থন করলেন একজন—তিনি বিকর্ণ; দুর্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতম। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনল না। অধিকন্তু দুঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন। দ্রৌপদী অসহায়। তিনি লজ্জাহারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুল হয়ে স্মরণ করলেন। কৃষ্ণের কৃপায় দ্রোপদীর লজ্জা নিবারণ হল। তাঁর গায়ে অফুরন্ত বস্ত্র দেখা গেল। দুঃশাসন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে পারলেন না।

দ্রৌপদীর অপমানে পাণ্ডবেরা চরম অপমানিত হলেন। ভীম আর থাকতে পারলেন না। তিনি আগুন দিয়ে যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দিতে চাইলেন। কেননা এই হাত

দিয়ে তিনি পাশা খেলেছিলেন। কিন্তু বাধা দিলেন অর্জুন। ক্রুদ্ধ ভীম কী আর করেন? সভায় দাঁড়িয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন—"আমি এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করব এবং গদাঘাতে উরুভঙ্গ করব দুর্যোধনের। তা যদি আমি না পারি তবে আমার স্থান যেন পিতৃপুরুষদের সঙ্গে না হয়।"

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞশালায় নানারকম অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল। শোনা গেল শৃগালের আর গর্দভের বিকট চিৎকার! গান্ধারী ছুটে এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে; সজলনয়নে পুত্রদের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। রাজাকে তিনি বোঝালেন—আজ সতীনারীর যে অবমাননা হয়েছে তার ফলে কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য।

ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেলেন। তিনি দ্রৌপদীকে স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে তিনটি বর দিতে চাইলেন। দ্রৌপদী নিলেন দুটি বর। একটিতে নিজের এবং অপরটিতে পঞ্চস্বামীর মুক্তি। ধৃতরাষ্ট্র তাতে স্বীকৃত হলেন এবং এ ছাড়া যুধিষ্ঠিরকে তার সমস্ত ধনসম্পদ ফিরিয়ে দিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে যাত্রা করলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

দ্বিতীয়বারের দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবদের বনবাস

ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহারে সকলে খুশী হলেন। হলেন না কেবল দুর্যোধন এবং তাঁর অনুচরেরা। অন্ধ পিতাকে তিনি

বোঝাতে লাগলেন, "আহত সর্প কি কাউকে ক্ষমা করে? পাণ্ডবেরাও আমাদের ক্ষমা করবে না। সুযোগ পেলেই তারা আমাদের ধ্বংস করবে। আপনি আবার তাদের দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করুন। এবারকার সর্ত হল, যারা হারবে তারা বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করবে। সেই অজ্ঞাতবাসের সময় যদি কেউ তাদের পরিচয় জানতে পারে তবে আবার বার বছরের জন্যে বনবাসে যেতে হবে।"

দুর্যোধনের এই প্রস্তাবে অন্ধ রাজা রাজী হলেন। সে কথা শুনে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বিকর্ণ সকলেই আপত্তি জানালেন। আপত্তি জানালেন দুর্যোধন-জননী গান্ধারীও। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন, "দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে অমঙ্গল দেখা দিয়েছিল। আপনি জেনে রাখুন এই পুত্র থেকে বংশ ধ্বংস হবে। মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণের এই প্রস্তাব আপনি প্রত্যাখ্যান করুন—ত্যাগ করুন কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে।"

গান্ধারীর এই হিতবাক্য ধৃতরাষ্ট্র গ্রহণ করলেন না। পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা বললেন—"আমি বারণ করতে অপারগ—কুলের ধ্বংস হোক্। পাণ্ডবেরা ফিরে আসুক; আমার ছেলেদের সঙ্গে আবার দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করুক।"

ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পঞ্চপাণ্ডব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে এলেন। বৃদ্ধ রাজার আহ্বান তারা উপেক্ষা করতে পারলেন না। শুধু বললেন, "বিধাতার নিয়োগ অনুসারে

মানুষ শুভাশুভ লাভ করে। আমাদের এ ক্রীড়ায় যোগদান না করে উপায় নেই।"

খেলা পুনরায় আরম্ভ হল। কৌরবদের হয়ে খেললেন শকুনি। এবারেও হারলেন সম্রাট যুধিষ্ঠির।

পণ অনুসারে দ্রৌপদীসহ বনবাসের জন্যে পঞ্চপাণ্ডব প্রস্তুত হলেন। রাজবেশ খুলে ফেলে তাঁরা পরলেন মৃগচর্ম। বিদুর বৃদ্ধা কুন্তীকে বনে যেতে দিলেন না; তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মাতা কুন্তী পুত্রদের এই দুরবস্থা দেখে খুবই বিলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবদের আনন্দ যেন আর ধরে না! ভীমকে 'গরু' 'গরু' বলে দুঃশাসন অপমান করতে লাগলেন। তাতে যোগ দিলেন কর্ণ, শকুনি এবং কৌরবেরা। সে অপমানে শুধু ভীম নয়; অর্জুন, নকুল, সহদেবও ধৈর্য হারালেন। ভীম আবার প্রতিজ্ঞা করলেন—তিনি সম্মুখ যুদ্ধে গদা দিয়ে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করবেন, দুঃশাসনের বুক চিরে করবেন রক্তপান এবং বধ করবেন সকল কৌরব ভ্রাতাদের। অর্জুন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরে এসে কর্ণকে আমি বধ করব।" নকুল বললেন—"কৌরবদের আমি যমালয়ে পাঠাব।" সহদেব ঘোষণা করলেন—তিনি শকুনিকে হত্যা করবেন। তের বছর পরে যে ভীষণ ঝড় উঠবে তার কথা ভেবে সকলে হলেন শঙ্কিত।

যুধিষ্ঠির কিন্তু ধৈর্য হারালেন না। তিনি যাত্রার পূর্বে ভাইদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম জানালেন। তাঁরা দুঃখে ও লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন। বিদ্বান বিদুর যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "যুধিষ্ঠির! তুমি ভয় পেয়ো না। অধর্মের দ্বারা কেউ জয়লাভ করে না। অধর্মের দ্বারা যে পরাজিত হয় সে কখনও দুঃখ পায় না।* তুমি ক্ষমাশীল। তোমার এই মহৎ গুণের বলে তুমি সকল অবস্থায় মঙ্গল লাভ করবে।"

এর পর তাঁরা মাতা কুন্তীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। তিনি সজল নয়নে দ্রৌপদীকে কাছে ডেকে বললেন, "রাজপুরীতে তুমি যেমন স্বামীদের সেবা করেছ বনবাসেও তুমি তেমনি স্বামীসেবা কোরো। আর মনে রাখবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন যেমন আমার স্নেহের পাত্র—নকুল ও সহদেব তেমনিই স্নেহভাজন। তুমি সকলেরই সমভাবে সেবাযত্ন করবে।"

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে হস্তিনানগর থেকে যখন বনের দিকে যাত্রা করলেন তখন বিনামেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ভূমিকম্প হল; দেখা গেল নানা অশুভ চিহ্ন।

* নাধর্মবিজিতঃ কশ্চিদ্ব্যথতে বৈ পরাজয়াৎ

বন পর্ব

পাণ্ডবদের বনগমন

পাণ্ডবেরা প্রথমে উত্তরমুখে চললেন। সঙ্গে রয়েছেন পুরোহিত ধৌম্য এবং ধার্মিক ব্রাহ্মণেরা। গঙ্গার তীরে একটি গাছের নীচে তারা রাত্রিবাস করলেন। ব্রাহ্মণেরা করলেন বেদগান। সকালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কেউ রাজী হলেন না। ধৌম্যের আদেশে যুধিষ্ঠির সূর্যের স্তব করলেন। "হে সূর্য! তুমি জগতের চক্ষু, সকল দেহধারী জীবের আত্মা, সকল জীবের জনক তুমি। তোমার পথের আবরণ নেই। তোমার কৃপায় জীবকুল লাভ করে অন্ন। হে অন্নপতি! আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাদের অন্নদান কর।"

দিবাকর প্রসন্ন হলেন; তিনি ধর্মরাজকে একটি তাম্রপাত্র দিলেন এবং বললেন, "দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই পাত্রের অন্ন ফুরোবে না।" পাণ্ডবদের অন্ন চিন্তা দূর হল। দ্রৌপদী মনের আনন্দে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের সেবা করতে লাগলেন। সূর্যদেব আরও একটি বর দিলেন যুধিষ্ঠিরকে—তের বছর পূর্ণ হলে তিনি অবশ্যই রাজ্য ফিরে পাবেন।

তারপর তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর পাণ্ডবেরা উপস্থিত হলেন কাম্যক বনে। এই বনে বাস করত বক রাক্ষসের ভাই কির্মীর। সে জানত ভীম তার ভাইকে হত্যা

করেছে। সে ছুটে এল ভীমকে হত্যা করতে। ভীম আর কি করেন—বনের একটা গাছ তুলে নিয়ে তাই দিয়ে কির্মীরকে শেষ করলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শুনতে পেয়েছেন পাণ্ডবদের বনবাসের কথা। হস্তিনাপুরে যখন দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল তখন তিনি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এলেন যদু বংশীয় আত্মীয় স্বজন নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে এই বনে দেখা করতে।

কাম্যকবনে প্রায় একবছর বাস করে পাণ্ডবেরা গেলেন দ্বৈতবনে। সেখানে সরস্বতী নদীর তীরে কুটির নির্মাণ করে তাঁরা বাস করতে লাগলেন।

সেখানে একদিন সকলে বসে আছেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে তাঁর মনের দুঃখ জানালেন—"আপনাকে এই বনে এমন দীন বেশে দেখে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। ক্ষত্রিয় কখনও ক্রোধহীন হয় না। তেজ প্রকাশ না করে চিরদিন ক্ষমা করে যাওয়াই যে ধর্ম, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তা বলেন না। সময়ে যে লোক কোমল হয় আবার প্রয়োজনে ভীষণ হয়ে উঠে পৃথিবীতে সেই সুখী হয়।"

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, "ক্রোধ মানুষের যেমন উন্নতির কারণ তেমনি আবার অবনতিরও কারণ। যে লোক ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তাকেই কি তেজস্বী বলে? হিতাহিত বিবেচনা করে তদনুযায়ী যে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে পণ্ডিতগণ তাকেই তেজস্বী বলে থাকেন।"

দ্রৌপদী এতে খানিকটা শান্ত ভাব ধারণ করলেও ভীম আশ্বস্ত হলেন না। তিনি অভিযোগ করে বললেন, "বনে বনে ভিক্ষে করে খাওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। কৌরবেরা সব সময় অন্যায় করছে আর আমরা তার প্রতিবাদ করতে গেলেই আপনি বাধা দিচ্ছেন। এ আপনার কি রকম ধর্ম তা বুঝতে পারছি না।"

যুধিষ্ঠির ভীমের কথায় ব্যথিত হলেন; তবুও শান্তভাবে বললেন, "তোমরা আমাকে যে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ, আমি তার যোগ্য সন্দেহ নাই। কৌরবদের প্ররোচনায় আমি পণ রেখে দ্যূতক্রীড়ায় যোগ দিয়ে অন্যায়ই করেছি। কিন্তু খেলায় সকলের সামনে যে পণ স্বীকার করেছি; যত কঠিন হোক না কেন, সে পণ আমাকে রাখতে হবে।"

অর্জুনের তপস্যা

এই দ্বৈত বনে পাণ্ডবেরা যখন বাস করছেন তখন একদিন ব্যাসদেব এলেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা দান করলেন এবং বলে গেলেন অর্জুন যেন আরও অস্ত্রলাভের জন্য ইন্দ্র ও শিবের তপস্যা করেন।

পাণ্ডবেরা স্থির বুঝেছিলেন—দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাঁদের রাজ্য দেবেন না। কাজেই অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। অর্জুন তাই ব্যাসের উপদেশে তপস্যার জন্য হিমালয়ের পবিত্র তীর্থ ইন্দ্রকীলে উপস্থিত হলেন। অর্জুনের কঠোর তপস্যায়

তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বললেন, "অর্জুন! তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই। তবে তুমি আগে দেবাদিদেব শিবকে তুষ্ট কর। তাঁর যখন দর্শন পাবে তখন আমি তোমাকে আমার দিব্য অস্ত্রগুলি দান করব।"

পাশুপত অস্ত্রলাভ

মহাদেবের আরাধনায় বসেছেন অর্জুন। কি কঠোর তপস্যা! কখন সূর্য ওঠে আর কখনই বা অস্ত যায় অর্জুন তা জানতে পারেন না। এমন কতদিন কেটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ একদিন অর্জুন দেখেন একটি নীলবর্ণ বরাহ গর্জন করে তেড়ে আসছে। তপস্যা থেকে উঠে তিনি বরাহকে মারবার জন্য ধনুর্বাণ ধরলেন। এমন সময়ে এক কিরাত উপস্থিত হল সেখানে। সে অর্জুনকে বাধা দিয়ে বলল—"এ বরাহ আমার শিকার—একে তুমি মেরো না।" কিরাতের কথা না শুনে অর্জুন তীর নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিরাত ও মারলেন একটি তীর। সে তীরে বিদ্ধ হল বরাহটি। নিহত বরাহটি নিয়ে অর্জুন ও কিরাতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হল; এবং ক্রমে সে বিবাদ পরিণত হল যুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অর্জুনের সকল অস্ত্র, সকল বিদ্যাই আজ বিফল হল। কিরাত রইল অপরাজিত। চিন্তিত হয়ে পড়লেন অর্জুন। তবে কি এতদিনের অস্ত্রশিক্ষা এবং এতদিনের তপস্যা সব বিফলে গেল! তিনি শিবের মূর্তি গড়ে পূজা

করতে লাগলেন। ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন শিবের মূর্তিতে। কিন্তু একি! সে মালা যে কিরাতের গলায়। তবে কি কিরাতের ছদ্মবেশে মহাদেব স্বয়ং এসেছেন তাঁর সামনে? অর্জুন স্তব করতে লাগলেন—"হে শিব, হে দেবাদিদেব! অবোধ আমি—না জেনে অপমান করেছি তোমার। তুমি ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও।"

প্রসন্ন হাসি হেসে আশুতোষ বললেন, "হ্যাঁ, আমি মহাদেব,
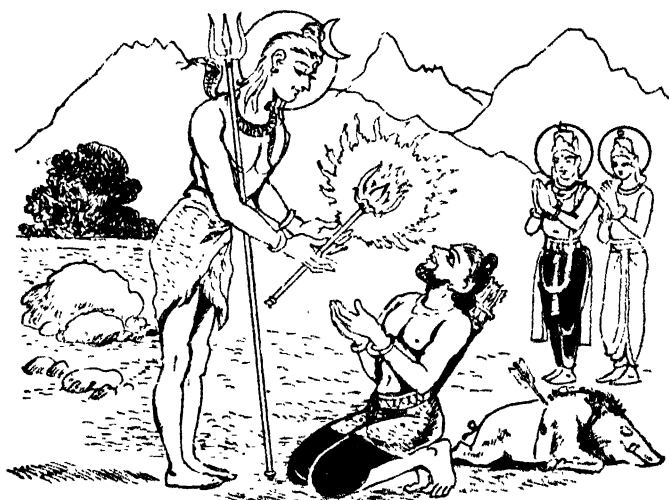
মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করলেন

—এতদিন ধরে তুমি যার জন্য তপস্যা করছ। আমি তোমার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়েছি।" তিনি অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান

করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যম, বরুণ, কুবেরও দান করলেন তাঁদের দিব্য অস্ত্রগুলি। এরপরে ইন্দ্রের সারথি মাতলি এলেন অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। ইন্দ্র-পুরীতে পাঁচ বৎসর বাস করে অর্জুন ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করলেন। গন্ধর্ব চিত্রসেন তখন ছিলেন সেখানে। অবসর সময়ে অর্জুন তাঁর কাছে শিখে নিলেন সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা। এই সময় ইন্দ্রের আদেশে দুষ্ট দৈত্য নিবাত কবচদেরও তিনি বধ করেছিলেন।

পাণ্ডবদের তীর্থভ্রমণ

অর্জুনের অদর্শনে যুধিষ্ঠির খুবই চিন্তিত। এমন সময় লোমশ মুনি এসে খবর দিলেন—অর্জুন স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করছেন। তাঁর ফিরতে দেরী হবে।

এই খবরে আশ্বস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতাদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরুলেন। তাঁরা প্রথমে গেলেন প্রয়াগে। প্রয়াগ থেকে গয়া, গয়া থেকে অগস্ত্য আশ্রমে, অগস্ত্য আশ্রম থেকে ভৃগুতীর্থে। তারপর তাঁরা গেলেন গঙ্গাসাগরে। এইস্থানে পূর্বে তপস্যা করতেন কপিল মুনি—যাঁর ক্রোধ দৃষ্টিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে ভগীরথের সাধনায় তুষ্ট হয়ে পতিত-পাবনী গঙ্গা স্বর্গ হতে নেমে আসেন। তাঁর পবিত্র স্পর্শে সগরের পুত্রেরা মুক্ত হয়েছিল। ভগীরথ এনেছিলেন বলে গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী।

গঙ্গাসাগর থেকে পাণ্ডবেরা যান মহেন্দ্র পর্বতে এবং দেখা পান পরশুরামের। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী তীর ও দ্রাবিড় দেশ ভ্রমণ করে তাঁরা যান পশ্চিম ভারতের প্রভাসতীর্থে। এখানে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করলেন কৃষ্ণ-বলরাম। তারপর যমুনা নদীর তীর ধরে তাঁরা অনেক জায়গা ভ্রমণ করলেন।

তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে পাণ্ডবেরা এলেন হিমালয়ে এবং দর্শন করলেন পুণ্যক্ষেত্র বদরিকাশ্রম। সেখানে তাঁরা কিছুদিন অপেক্ষা করতে লাগলেন অর্জুনের জন্য। একদিন অপরূপ এক স্বর্ণকমল উড়ে এসে পড়ল দৌপদীর গায়ে। কমলটি সহস্রদল। তা দেখে দৌপদী এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি ভীমকে ধরে বসলেন, এইরূপ স্বর্ণকমল তাঁর আরও কিছু চাই।

ভীমসেন চললেন পদ্মের সন্ধানে। বহুদূর যাওয়ার পর দেখলেন তাঁর পথে শুয়ে আছে একটি হনুমান। ভীম তাকে পথ দেওয়ার জন্যে আদেশ করলেন। কিন্তু হনুমান তাঁর কথা গ্রাহ্যই করল না। ভীম এতে অপমানিত বোধ করলেন এবং লেজটা ধরে এর সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একি হল, ভীমের মত বীর এই হনুমানের লেজটি একটুও নড়াতে পারলেন না। হনুমান তখন সহাস্যে বললে, "ভয় পেও না। আমি পবননন্দন হনুমান, তোমার দাদা। এগিয়ে যাও—গন্ধমাদন পর্বতে রয়েছে কুবেরের উদ্যান। তার মধ্যে সুন্দর এক সরোবরে দেখবে, ফুটে রয়েছে তোমার

আকাঙ্ক্ষিত সহস্রদল পদ্ম। আর একটি কথা; পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। রথের ধ্বজা হয়ে আমি থাকব সর্বদা।"

দেরী দেখে যুধিষ্ঠির, সকলকে নিয়ে ভীমকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরাও এসে হাজির হলেন কুবেরের উদ্যানে। প্রথমে রক্ষীরা ভীমকে বাধা দিল। কিন্তু স্বয়ং কুবের এলেন সরোবর তীরে। তিনি পদ্ম তোলবার অনুমতি দিলেন এবং পরম আদরে পাণ্ডবদের বাসের জন্য গন্ধমাদন পর্বতে ব্যবস্থা করলেন।

অন্য একদিন বনের মধ্যে ভীম খুবই বিপদে পড়েছিলেন। এক অজগর তাঁকে জড়িয়ে ধরে গ্রাস করতে চাইল। ভীম পরিচয় নিয়ে জানলেন, অজগরটি আসলে সাপ নয়; অভিশপ্ত রাজা নহুষ। রাজা নহুষ ছিলেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তিনি ব্রহ্মর্ষিদের ধরে ধরে পাল্কী বইয়ে নিতেন। অগস্ত্য মুনি এজন্য তাঁকে অভিসম্পাত করেন। সেই শাপের ফলেই রাজা নহুষ অজগর হয়ে জন্মেছিলেন। ভীমকে দেখতে না পেয়ে যুধিষ্ঠিরও এসে হাজির হন এই বনে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে অজগর ভীমকে ছেড়ে দেয়; আর নিজেও শাপমুক্ত হয়। শাপমুক্ত নহুষ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন,—"যুধিষ্ঠির, ঐশ্বর্য থেকে সাবধান থেকো। ঐশ্বর্য থেকে আসে আসক্তি এবং

সেই আসক্তি আনে অহঙ্কার। অহঙ্কারে আমার সমস্ত বুদ্ধি নষ্ট হয়েছিল ; যার ফলে আমার এই অবস্থা।"

এর কিছুদিনের মধ্যেই স্বর্গ থেকে অর্জুন ফিরে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

কৌশিক ব্রাহ্মণ ও ধর্মব্যাধ

অর্জুন ফিরে আসার পর যুধিষ্ঠির আরও অনেকদিন রইলেন গন্ধমাদন পর্বতে। তারপর তাঁরা গেলেন কাম্যক বনে। এখানে থাকবার সময় মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁদের নানারকম উপাখ্যান শুনাতেন।

একদিন তিনি কৌশিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যানটি বললেন। কৌশিক ছিলেন কঠোর তপস্বী। একটি গাছের তলায় বসে তিনি তপস্যা করতেন ; আর করতেন বেদপাঠ। একদিন ঐ গাছের উপর থেকে একটি বক মলত্যাগ করল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ যেমন উপরের দিকে তাকালেন তেমনি বকটি ভস্ম হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ ভাবলেন, তাঁর তপস্যার ক্ষমতা এতখানি! তারপর একদিন ভিক্ষায় গেছেন। ভিক্ষা দিতে দেরি হচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণ মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি ভাবলেন "এরা জানে না আমি মনে করলে এদের ভস্ম করে দিতে পারি।" গৃহিনী তখন স্বামী সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামী সেবাই সব চেয়ে বড় ধর্ম। তাই তিনি বেরিয়ে এসে শুধু

বললেন, "আমি গাছের বকপাখী নই যে আমাকে ভস্ম করে দেবেন। আমি নারীর যা ধর্ম তাই পালন করেছি। আমাকে ভস্ম করতে পারবেন না। আর দম্ভ থাকা ভাল নয়। তাতে ধর্ম হয় না। নিজ নিজ কর্তব্য করার মধ্যেই রয়েছে ধর্ম। মিথিলায় ধর্মব্যাধ আছেন ; আপনি তাঁর কাছে যান। ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন।"

কৌশিক ব্রাহ্মণ গেলেন ধর্মব্যাধের কাছে। ব্যাধ তখন পশুর মাংস বিক্রয় করছে। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, "এই ব্যক্তি আমায় কি ধর্ম শিক্ষা দেবে!" তারপর ব্যাধ যখন কথা বলা শুরু করল তখন ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হলেন। ব্যাধ বলল "আমি পূর্ব জন্মের কুকর্মের ফলে ব্যাধ হয়েছি। ব্যাধের মত আমি মাংসও বিক্রী করি ; কিন্তু নিজে মাংস খাই না। আমি কাউকে ঠকাই না, মিথ্যা কথা বলি না ; যতটা পারি দান করি। তবে আমি সব থেকে বড় ধর্ম মনে করি আমার গৃহদেবতার সেবাকে।" এই বলে তিনি কুটিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণকে এবং দেখালেন তাঁর নিত্য পূজিত গৃহদেবতা আর কেউ নন, তাঁর নিজেরই পিতামাতা। পিতামাতার সেবা পরম ধর্ম।

ধর্মব্যাধের কথা শুনে ব্রাহ্মণের চৈতন্য হল। তিনিও চললেন নিজ পিতামাতার সেবার জন্য।

দুর্যোধনের নিগ্রহ

যে যেমন লোক তার সঙ্গীও জুটে তেমন। দুর্যোধনের পরামর্শদাতা হলেন মামা শকুনি। দ্বৈতবনে যখন পাণ্ডবেরা নিতান্ত দীনহীন ভাবে বাস করছেন তখন দুর্যোধনকে শকুনি ও কর্ণ পরামর্শ দিলেন, কৌরবদের বৈভব একবার দেখান যাক্। ভীষ্ম, দ্রোণ এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। তাঁরা দুর্যোধনের সঙ্গে গেলেনও না। কিন্তু পুরমহিলা, বন্ধুবান্ধব এবং সৈন্য সামন্ত নিয়ে দুর্যোধন যাত্রা করলেন দ্বৈতবনের দিকে। সেকি সমারোহ! দ্বৈতবনে যখন তাঁরা পৌঁছুলেন তখন সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনও ছিলেন তাঁর পরিজন নিয়ে। এখানে একটি মনোরম সরোবরে গন্ধর্বেরা স্নান করছিলেন। কৌরবদের তা সহ্য হলো না। দুর্যোধন সসৈন্যে সেই গন্ধর্বদের আক্রমণ করলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন স্বয়ং চিত্রসেন। চিত্রসেনের মায়াযুদ্ধে দুর্যোধন পরাস্ত হলেন এবং কর্ণ পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। তখন চিত্রসেন বন্দী করলেন কৌরব পত্নীদের এবং শতভাই দুর্যোধনকে।

কুরু সৈন্যেরা এই খবর দিলেন পাণ্ডবদের আশ্রমে। যে পাণ্ডবদের অপমান করার জন্য কৌরবেরা গিয়েছিল, অবশেষে তাদেরই সাহায্য চাইতে হল! ভীম এতে খুব

তিনি বললেন, "বেশ হয়েছে, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে কৌরবদের।" কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, "কী বলছ ভীম! যে আমাদের সকলের অপমান। কৌরবদের পরাজয়

আমাদের সমস্ত ভরত বংশের পরাজয়। যাও, তোমরা চার ভাই মিলে কৌরব ভাই আর পুরনারীদের মুক্ত করে নিয়ে এস।" ভীমসেন, পার্থ, নকুল ও সহদেব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। গন্ধর্বদের সাথে তাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ হল। অর্জুনের বাণে বাণে গন্ধর্বেরা এবং স্বয়ং চিত্রসেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা পরাজিত হলেন। কিন্তু তা সত্বেও চিত্রসেন দুর্যোধন বা তার পুরনারীদের মুক্তি দিতে চাইলেন না। তিনি অর্জুনকে বললেন—"এই দুর্বৃত্ত কৌরবেরা তোমাদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। স্বর্গে ইন্দ্র আমাকে এ আদেশ করেছিলেন।" যাই হোক তারপর তাঁরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন তাঁর আদেশে দুর্যোধন ও কৌরব নারীদের মুক্ত করা হল।

দুযোধন মাথা নীচু করে ফিরে এলেন রাজধানীতে।

দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি

দুর্যোধন সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে যুধিষ্ঠিরকে আবার জব্দ করা যায়। এক সুযোগও এল। দুর্বাসা মুনি সশিষ্য এসেছেন দুর্যোধনের পুরীতে। তাঁর আদর যত্নে তুষ্ট হয়ে মুনি দুর্যোধনকে বর দিতে চাইলেন। তখন দুর্যোধন তাঁকে অনুরোধ করলেন—মুনি যেন তাঁর দশ হাজার শিষ্য নিয়ে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন, অবশ্য দ্রৌপদীর আহার শেষ হবার পরে। মুনি এ কথায় রাজী হলেন। একদিন অপরাহ্ণ

অতীত ; দ্রৌপদীরও আহার শেষ হয়েছে। এমন সময় দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা অতিথি হলেন পাণ্ডবদের। যুধিষ্ঠির তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা করে স্নান আহ্নিকের জন্য নদীতে পাঠালেন। দ্রৌপদী হলেন বিপন্ন—কী খেতে দেবেন এতগুলি লোককে। সূর্যদেবের দেওয়া তাম্রস্থলী তখন শূন্য। কোন উপায় না দেখে দ্রৌপদী সকাতরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। —"হে কৃষ্ণ, হে জগৎপতি, ভগবানের অবতার তুমি। তুমি বিপদ বারণ। এ বিপদ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার কর। একদিন তুমিই কৌরব সভায় চরম অপমানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে।" দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে কৃষ্ণ দেখা দিলেন কিন্তু বললেন, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, কি আছে তোমার সেই সূর্যদেবের দেওয়া তাম্রপাত্রে ?" দ্রৌপদী ভাবলেন, এই বিপদের সময় কৃষ্ণ আবার একি কথা বলেন। কৃষ্ণ তখন বারে বারে বলছেন,—"কই দ্রৌপদী ! খেতে দাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে।" দ্রৌপদী আর কি করেন ! আনলেন সেই তাম্রস্থলী। কৃষ্ণ দেখলেন পাত্রের এক পাশে একটি অন্নকণা। সেই কণাটি মুখে দিয়ে বললেন— "এই অন্ন ভোজনে জগতের সকলে তৃপ্ত হোন্।" তাই বলে কৃষ্ণ ঢেকুর তুলতে লাগলেন আর যুধিষ্ঠিরকে বললেন সশিষ্য দুর্বাসাকে আহারের জন্য ডেকে আনতে।

এদিকে দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যরা নদীতে স্নান করতে করতে দেখেন ঘন ঘন তাঁদের ঢেকুর উঠছে। তাঁরা যেন এইমাত্র খেয়ে

উঠেছেন। আর খাবেন কি করে! লজ্জায় সশিষ্য দুর্বাসা বিদায় নিলেন। মুনি এবং শিষ্যদের ডাকতে এসে সহদেব কোথাও তাঁদের খুঁজে পেলেন না।

জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ

আর এক দিনের ঘটনা; পঞ্চ পাণ্ডব গেছেন মৃগয়ায়। ঘরে রয়েছেন একা দ্রৌপদী। এমন সময় আশ্রমে উপস্থিত হলেন সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ। বহু সৈন্য তাঁর সঙ্গে।

জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগ্নীপতি, দুঃশলার স্বামী। দ্রৌপদী মাননীয় আত্মীয়ের যথোচিত আপ্যায়ন করলেন পঞ্চাশটি মৃগ দিলেন অতিথিদের জলখাবারের জন্য। কিন্তু জয়দ্রথ বললেন, "আমি এখানে খেতে আসিনি—এসেছি তোমাকে হরণ করে আমার রাজপুরীতে নিয়ে যেতে।" দ্রৌপদী তাঁর শক্তিমত বাধা দিলেন। বাধা দিলেন ধৌম্য পুরোহিত। কিন্তু তাঁরা পারবেন কেন যোদ্ধা জয়দ্রথের সঙ্গে? দ্রৌপদীকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন জয়দ্রথ এদিকে যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে এসে যখন এই নিদারুণ সংবাদ শুনলেন তখন দ্রৌপদীর উদ্ধারের জন্য পাঠালেন ভীম ও অর্জুনকে। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের দেখে ভয়ে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে পালাতে লাগলেন। ভীম অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে জয়দ্রথকে বন্দী করে ফেললেন এবং আর একটু হলে প্রাণে মেরেও ফেলতেন। কিন্তু পাছে ভগ্নী দুঃশলা বিধবা

হয়, তাই ভীম আর তাকে প্রাণে মারলেন না। জয়দ্রথের মাথা মুড়িয়ে শুধু তাঁকে শপথ করিয়ে নিলেন তিনি যেন আজ থেকে নিজেকে পাণ্ডবদের কিঙ্কর বলে পরিচয় দেন।

জয়দ্রথ অপমানে দুঃখে নিজের রাজ্যে আর ফিরলেন না; হিমালয়ের গঙ্গাদ্বারে গিয়ে তপস্যা করলেন। উদ্দেশ্য অর্জুনকে পরাজিত করা। শিব তাঁকে বর দিলেন—"অর্জুনকে পরাজিত করার ক্ষমতা তোমার হবে না। কিন্তু অপর চার পাণ্ডবকে একদিনের জন্য যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে।"

দাতা কর্ণ

দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন পাণ্ডবদের পরম বন্ধু। পাণ্ডবদের বার বছরের বনবাস প্রায় পূর্ণ হয়ে এল। এমন সময় তিনি একদিন কর্ণের কাছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হলেন এবং কর্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর সহজাত কবচ ও কুণ্ডল। এই কবচ ও কুণ্ডল ছিল কর্ণের প্রাণের সমান। যতদিন কর্ণ তা ধারণ করবেন ততদিন কর্ণকে বধ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু কর্ণ ছিলেন প্রকাণ্ড দাতা। তিনি প্রতিদিন স্নানের পর সূর্যের স্তব করতেন। এই সময় তাঁর কাছে যিনি যা প্রার্থনা করতেন তা তিনি পূরণ করতেন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা তিনি আজ কি করে প্রত্যাখ্যান করবেন? সূর্যদেব পূর্বাহ্নে কর্ণকে ইন্দ্রের আসবার

কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন "আমি জানি, আপনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আপনি এসেছেন আপনার স্নেহভাজন অর্জুনের জীবন বাঁচাবার জন্য আমার এই কবচ ও কুণ্ডল হরণ করতে। তবুও আপনার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব।" নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দাতা কর্ণ ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল অর্পণ করলেন। প্রতিদানে ইন্দ্র তাঁকে দিলেন 'একাঘ্নী' অস্ত্র। এই অস্ত্র কর্ণ যার উপরে নিক্ষেপ করবেন তার নিস্তার নেই। কিন্তু একজন মাত্র শত্রুকে বধ করেই সে অস্ত্র ফিরে যাবে ইন্দ্রের কাছে।

ধর্ম ও যুধিষ্ঠির

পাণ্ডবেরা বাস করছেন দ্বৈত বনে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন তার যজ্ঞের আগুন জ্বালাবার অরণি ও মন্থ নামে কাঠ দুখানি এক হরিণ নিয়ে পালিয়েছে। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পাণ্ডবেরা যদি তা উদ্ধার করে দেন। পাণ্ডবেরা তীর ধনু নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই হরিণের খোঁজে।

হরিণের পেছন ছুটতে ছুটতে তাঁরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তৃষ্ণায় তাঁরা সবাই কাতর। এমন সময় নকুল একটি সরোবরের সন্ধান দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "তুমি তূণীর ভরে জল নিয়ে এস। আমাদের তৃষ্ণা দূর হোক।"

নকুল জলাশয়ের কাছে গিয়ে যেমনি জল পান

করতে যাবেন তেমনি কে যেন অন্তরীক্ষ থেকে বলে উঠল "আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়ে জল খেও না। উত্তর না দিয়ে যদি জল স্পর্শ কর তবে প্রাণ হারাবে।" পিপাসায় কাতর নকুল সে কথা না শুনে জল খেতে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হল। নকুলের দেরী দেখে যুধিষ্ঠির পাঠালেন সহদেবকে। অন্তরীক্ষবাসীর সেই কথা অবজ্ঞা করে সহদেব যখনি জল পান করতে গেলেন তখনি তাঁরও নকুলের মত

যুধিষ্ঠির দেখলেন—ইন্দ্রতুল্য ভাইদের প্রাণহীন দেহ

একই দশা হল। তারপর অর্জুন ও ভীম গেলেন। বলা বাহুল্য তাঁরাও জল নিয়ে ফিরতে পারলেন না; সরোবরের তীরে প্রাণ হারাতে হল। অবশেষে গেলেন যুধিষ্ঠির। জলাশয়ের

কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন ইন্দ্রতুল্য ভাইদের প্রাণহীন দেহ। কি করে এ সম্ভব হল তা যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন। তখন অন্তরীক্ষ হতে সেই বাণী তিনি শুনতে পেলেন—"আমি জলচর বক। এই জলাশয় আমার অধিকারে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করো না। তাহলে অপর ভাইদের মত তোমাকেও প্রাণ হারাতে হবে।"

যুধিষ্ঠির সবিস্ময়ে বললেন—"আপনি নিশ্চয়ই সামান্য জলচর পক্ষী নন। একটি পক্ষীর কাছে আমার বীর ভ্রাতারা কখনই পরাজিত হতে পারে না। আপনি যিনিই হোন—বলুন আপনার প্রশ্ন। আমি সাধ্যমত তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।"

বকরূপী ধর্ম একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং তার সবগুলির উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির। সে উত্তরগুলি খুবই সুন্দর। এখানে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর দেওয়া হল।

বক প্রশ্ন করছেন: "বার্তা কি? এ জগতে আশ্চর্য কি? পথই বা কি? প্রকৃত সুখী কে?"[১] *

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, "কাল প্রতি মুহূর্তে প্রাণীদের আয়ু হরণ করছে—এই হল বার্তা। প্রতিদিন মানুষ মরছে; এমন কোন পরিবার নেই যার সকলেই চিরকাল বেঁচে আছে।

---

* কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে
বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ মৃতা জীবন্তু বান্ধবাঃ।

তবুও আমরা যারা বেঁচে আছি তারা মনে করি আমরা কখনও মরব না—এই হল জগতের সব আশ্চর্যের মধ্যে সেরা আশ্চর্য।* মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তাই হল প্রকৃত পথ। আর সুখী সেই যার দেনা নেই বা যাকে প্রবাসে দিন কাটাতে হয় না।" যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে বক তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "আমি বক নই, আমি স্বয়ং ধর্ম। তোমার উত্তরগুলি যথাযথ হয়েছে। আমি তোমার মৃত ভাইদের মধ্যে একজনকে বাঁচিয়ে দিতে চাই। বল কাকে বাঁচিয়ে দোব?"

যুধিষ্ঠির বললেন "যদি একজনকেই বাঁচাতে হয় তবে নকুল বেঁচে উঠুক।" ধর্ম বললেন, "তুমি ভীম-অর্জুনকে বাদ দিয়ে কেন নকুলের নাম করছ? তোমাকে ত দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।" ধর্মরাজ বললেন, "ভীম-অর্জুন দিগ্বিজয়ী বীর, আমার প্রাণের প্রাণ। কিন্তু আমার দুই জননী: কুন্তী ও মাদ্রী। জননী কুন্তীর সন্তান আমি জীবিত আছি। মাতা মাদ্রীরও একটি সন্তান জীবিত থাক। তাই আমার প্রার্থনা নকুলের প্রাণ দান করুন।"

ধর্ম এ কথায় এতই সন্তুষ্ট হলেন যে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব চার ভাইকেই বাঁচিয়ে দিলেন। ধর্ম বললেন, "তোমাদের বনবাসের বার বছর পূর্ণ হয়ে এল। এবার

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্॥

এক বছর তোমাদের অজ্ঞাতবাস। তোমরা এবার মৎস্য রাজ্যের রাজধানী বিরাট নগরে গিয়ে বাস কর। আমি বর দিচ্ছি এই অজ্ঞাতবাসের সময় তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না।" আর এই সঙ্গে তিনি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিলেন সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অরণি ও মন্থ কাঠ দুখানি—যার জন্য তাঁরা ছুটে এসেছিলেন এই বনের মধ্যে।

বিরাট পর্ব

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস

এবার অজ্ঞাতবাসের পালা। ধৌম্য পুরোহিত এবং অন্যান্যরা বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে চললেন বিরাট রাজাব রাজধানীতে। এবার তাঁদের ছদ্মবেশে থাকতে হবে। তাঁরা পরামর্শ করে নিলেন, কে থাকবেন কিভাবে। নগরের প্রান্তে ছিল এক প্রকাণ্ড শ্মশান। তার একটি শমী বৃক্ষে পাণ্ডবেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন এবং তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন একটি শবদেহ, ভয়ে যাতে তার কাছে কেউ না যায়।

বিরাট রাজার রাজসভায় যুধিষ্ঠির প্রবেশ করলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। তিনি রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, "আমি ভাল পাশা খেলতে পারি ; আমার নাম কঙ্ক। পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ছিলাম। আপনি যদি আমাকে নিয়োগ করেন তবে আমি আপনার চিত্ত বিনোদন করতে পারব।" বিরাট রাজা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

পরে এলেন ভীম—নাম বললেন বল্লব। হাতে হাতাখুন্তি —পাচকের বেশ। তিনি রাজাকে বললেন, "আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম। মল্লযুদ্ধেও আমার দক্ষতা আছে। আপনার কাছে আমি কর্মপ্রার্থী।"

বল্লব পেলেন পাকশালায় পাচকদের অধ্যক্ষের পদ।

দ্রৌপদী মলিন বস্ত্রে নিজের স্বর্ণকান্তি ঢেকে পরিচয় দিলেন সৈরিন্ধ্রী নামে। রাণী সুদেষ্ণার কাছে তিনি বললেন, "শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ও পাণ্ডবপত্নীদের আমি মনোরঞ্জন করতাম ছবি এঁকে, মালা গেঁথে এবং চুল বেঁধে। পাঁচজন গন্ধর্ব আমার স্বামী কিন্তু অবস্থা বিপাকে আমি আজ নিরাশ্রয় ; তাই আপনার কাছে আশ্রয় চাই। তবে আমার পক্ষে দুটি কাজ করা সম্ভব হবে না ; কারুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ বা কারুর পাদস্পর্শ করা।" রাণী সুদেষ্ণা তাতেই রাজী হয়ে তাঁকে নিযুক্ত করলেন নিজের সহচরী রূপে।

এরপর এলেন সুদেহী সহদেব। তিনি এলেন গোয়ালার বেশে ; অরিষ্টনেমি নাম নিয়ে। বিরাট রাজা তাঁকে নিযুক্ত করলেন গোগৃহের অধ্যক্ষ পদে।

পরম রূপবান অর্জুন এলেন—নপুংসকের বেশে। তিনি বললেন, "আমার নাম বৃহন্নলা। নৃত্যগীতে আমি পারদর্শী।" রাজা তাঁকে নিযুক্ত করলেন কন্যা উত্তরার নৃত্যগীতের শিক্ষকরূপে।

গ্রন্থিকের ছদ্মনামে বলবান নকুল নিযুক্ত হলেন অশ্বশালার তত্ত্বাবধানে।

কীচক বধ

অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি একরকম ভালই চলছে। কিন্তু বিপদ হল রাণী সুদেষ্ণার ভ্রাতা কীচককে নিয়ে। রাজার

শ্যালক বলে তার প্রতিপত্তি ছিল খুব। প্রজাদের উপর সে দারুণ অত্যাচার করত। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলত না। সেই কীচক দ্রৌপদীকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কীচকের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে দ্রৌপদী ভীমকে সব জানালেন। ভীমের পরামর্শ মত দ্রৌপদী কীচককে বললেন, রাত্রিতে গোপনে সে যদি নৃত্যশালায় আসতে পারে তবে এ বিয়ে হতে পারে। কীচক গভীর রাত্রে এসে উপস্থিত হল নৃত্যশালাতে। মনে খুব আনন্দ; সৈরিন্ধ্রীকে আজ সে বিয়ে করবে। কিন্তু ভীম ছিলেন অন্ধকারে গা ঢেকে। কীচক আসা মাত্র গলা টিপে তাকে বধ করলেন। ভোরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব স্বামীরা কীচককে মেরে রেখে গেছে।

উত্তর গোগৃহ যুদ্ধ

দুর্যোধনের গুপ্তচরেরা চেষ্টায় ছিল, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের খবর জানবার জন্য। এই অজ্ঞাতবাসের খবর যদি দুর্যোধন একবার জানতে পারেন তবে পাণ্ডবদের আবার বার বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। কিন্তু গুপ্তচরেরা পাণ্ডবদের কোন হদিশ পেল না। তারা দুর্যোধনের কাছে নিয়ে এল শুধু কীচকের মৃত্যু সংবাদ।

দুর্যোধনের রাজসভায় তখন উপস্থিত ছিলেন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা। ত্রিগর্তরাজ অনেকবার চেষ্টা করেছেন বিরাটের

দেশ জয় করতে কিন্তু এই কীচকের কাছে বারে বারে পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। কীচকের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি প্রস্তাব করলেন বিরাটরাজাকে আক্রমণ করা যাক। তাহলে তাঁর সব গোধন জয় করা যাবে। সুশর্মার এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন কর্ণ ও শকুনি। সুশর্মা সসৈন্যে বিরাট রাজ্যের দক্ষিণদিক আক্রমণ করলেন এবং এক লক্ষ গরু হরণ করে নিয়ে গেলেন।

গোহরণের সংবাদ পেয়ে বিরাটরাজ চললেন সেগুলি উদ্ধার করতে। সঙ্গে গেলেন ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব। সুশর্মা প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। বিরাটরাজ হলেন বন্দী। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম তাঁকে উদ্ধার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করলেন সুশর্মাকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির সুশর্মাকে মুক্তি দিয়ে বললেন—"তুমি এখান থেকে পালাও—এমন কাজ আর জীবনে কোরো না।"

বিরাটরাজা দক্ষিণদিকে সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই সুযোগ বুঝে দুর্যোধন আক্রমণ করলেন উত্তরদিকে। বিরাটরাজার সৈন্যসামন্ত তখনও রাজধানীতে ফেরেনি। একা অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবেরাও সকলে রয়েছেন বিরাটরাজার সঙ্গে। গোপালক তখন খবর দিলেন রাজকুমার উত্তরকে; কেননা নগর রক্ষার ভার তখন রাজকুমারের। তিনি এই কথা শুনে বড়াই করে বললেন, "আমি যুদ্ধ করতে ভয় পাই না, তবে আমার সারথি নেই। আমি যুদ্ধ করি কি করে?" এমন সময়

সৈরিন্ধ্রী জানালেন, "বৃহন্নলা সারথির কাজ জানেন। যদি কেউ তাঁকে রাজী করাতে পারেন তবে এ বিপদে রক্ষা হয়।"

রাজকুমারী উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা সারথি হলেন এবং উত্তরকে নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাজকুমার উত্তর দেখলেন এক জনসমুদ্র। সৈন্য আর সৈন্য! সৈন্যদের উত্তাল তরঙ্গমালা। তার উপর শুধু দুর্যোধন নয়—বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতিও উপস্থিত। তাই না দেখে উত্তর এত ভয় পেলেন যে, রথ থেকে লাফিয়ে পালিয়ে

বৃহন্নলা উত্তরকে বললেন—'তুমি ভয় পেয়ো না'

যেতে চাইলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তুমি ভয় পেয়ো না। আমি যুদ্ধ করছি; তুমি

শুধু রথ চালাও।” তারপর শমীবৃক্ষ থেকে পাণ্ডবদের লুকোনো সেই সব অস্ত্র নামান হল। রাজকুমার সেই উজ্জ্বল অস্ত্রগুলি দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। অর্জুন তখন উত্তরের কাছে নিজের এবং কঙ্ক প্রভৃতি সকলের পরিচয় খুলে বললেন। বলা বাহুল্য অজ্ঞাতবাসের একবছর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

অর্জুন তখন নিজের বর্ম গ্রহণ করলেন এবং গাণ্ডীবে দিলেন টঙ্কার।

গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনে দ্রোণাচার্য বললেন দুর্যোধনকে—“অর্জুন ছাড়া এ আর কেউ নয়।” দুর্যোধন একথা শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, “তাই যদি হয় তবে পাণ্ডবদের আবার বার বছর বনবাসে যেতে হবে। কেননা অজ্ঞাতবাসের বছরটি ত এখনও পূর্ণ হয়নি।” কিন্তু গণনা করে জানা গেল তা ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রোণাচার্যের পায়ের এবং কানের কাছে কয়েকটি বাণ এসে পড়ল। আচার্য নিঃসন্দেহ হলেন। অর্জুন আচার্যকে বাণ দ্বারা প্রণাম জানিয়ে কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমেই তিনি বাধা দিলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন কিছু গরু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্জুন সেই গরুগুলিকে উদ্ধার করলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও অর্জুনের কাছে পরাস্ত হলেন। শেষে অর্জুনের সম্মোহন বাণে সমস্ত রথী মহারথীরা (একা ভীষ্ম বাদে) সংজ্ঞাহীন হয়ে রণক্ষেত্রে

পড়ে রইলেন। সকলকে পরাস্ত করে এবং সমস্ত গো-ধন উদ্ধার করে অর্জুন ফিরে এলেন রাজধানীতে। সংজ্ঞালাভ করে পরাজিত কৌরবেরা অপমানের পশরা মাথায় নিয়ে ফিরে গেলেন হস্তিনায়।

রাজকুমার উত্তরের কাছে বিরাটরাজ সব শুনলেন। তিনি পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর পরিচয় পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। আর প্রস্তাব করলেন কন্যা উত্তরাকে অর্জুনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার। অর্জুন এতে আপত্তি জানালেন, বললেন যে উত্তরা তাঁর শিষ্যা, কন্যার সমান। তখন স্থির হল অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হবে। অভিমন্যু তখন ছিলেন মাতুলালয় দ্বারকায়। দ্বারকা থেকে তাঁকে আনান হল। সঙ্গে এলেন কৃষ্ণ-বলরাম এবং দ্বারকার মহাবীরেরা। মহা সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হল। বিরাটরাজা ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলেন প্রচুর এবং জামাতাকে যৌতুক দিলেন অগণিত হাতী, ঘোড়া এবং বহুমূল্য মণিমুক্তা। আনন্দের বান ডাকল বিরাটনগরে।

উদ্যোগ পর্ব

পাণ্ডবগণের মন্ত্রণা

বিরাট রাজধানীতে বিবাহ উৎসব সম্পূর্ণ হল। উৎসব উপলক্ষে পাণ্ডবদের আত্মীয় স্বজন অনেকে এসেছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম তো ছিলেনই, দ্রুপদ রাজাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে সমবেত হলেন এক সভায়। সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পাণ্ডবগণের বনবাসের বার বছর এবং অজ্ঞাত বাসের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। দুর্যোধন পাশাখেলার ছল করে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করেছিল। কী দুঃখকষ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়ে পাণ্ডবদের দিন কেটেছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। এখন ইচ্ছা করলে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করে তাঁদের রাজ্য পুনরায় লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ চান না, চান শান্তি। ধর্মের পথই তাঁরা চিরকাল অনুসরণ করে এসেছেন। এখন কুরুগণের কোন অকল্যাণ যাতে না হয় এবং পাণ্ডবগণ তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফেরৎ পান আপনারা সকলে তার উপায় করুন।"

বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করলেন। তবে তিনি আপোষের পক্ষপাতী। কিন্তু সাত্যকি তাতে পুরোপুরি সায় দিলেন না। তিনি বললেন—"হ্যাঁ, কৌরবদের কাছে রাজ্য চাওয়া হোক। আপোষে যদি না দেয় তবে অস্ত্র প্রয়োগ করে তা অধিকার করতে হবে এবং সে জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।"

জ্ঞানী ও প্রবীণ রাজা দ্রুপদ বললেন, "আমারও ধারণা কৌরবেরা শুধু কথায় রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। শেষ পর্যন্ত বল প্রয়োগের দরকার হবে। সুতরাং এখুনি দেশে দেশে দ্রুতগামী দূত পাঠান হোক, যাতে আমাদের মিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যে ভাবে বলছেন সে ভাবে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আমাদের দূতও যাবে। কেননা কুরু-সভায় এখনও জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর প্রভৃতি রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করলে হয়ত বা এই শান্তির প্রস্তাব কার্যকর হতে পারবে।"

সভাভঙ্গ হল। রাজারা যে যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ-বলরামও দ্বারকায় যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবেরা রইলেন বিরাট রাজার রাজধানীতে। যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন চলল। পাণ্ডবদের দূত গেলেন বিভিন্ন রাজ্যে, সকলকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের অনুরোধ জানাতে। শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাওয়ার জন্যে অর্জুন নিজে গেলেন দ্বারকায়।

সৈন্য সংগ্রহ

এদিকে দুর্যোধনও প্রস্তুত হচ্ছেন। নানা দেশে দূত পাঠিয়ে তিনি নিজে গিয়ে হাজির হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এবং ঠিক অর্জুন যাওয়ার একটু আগে। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর শিয়রে ছিল এক রত্নময় সিংহাসন। দুর্যোধন

বসলেন তাতে। আর অর্জুন বসলেন তাঁর পায়ের কাছে। কৃষ্ণ চোখ মেলে প্রথম দেখলেন অর্জুনকে এবং তারপর দুর্যোধনকে। কৃষ্ণ সবই বুঝতে পেরেছিলেন তবুও জিজ্ঞাসা করলেন; তাদের উভয়ের আগমনের হেতু কি? দুজনেই প্রার্থনা করলেন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দলে পেতে। তাঁদের কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি নিজে যুদ্ধ করবো না তবে উপদেষ্টা হিসাবে থাকতে পারি। আর আমার এক অর্বুদ (দশকোটি) নারায়ণী সৈন্য আছে। তারা প্রত্যেকেই আমার সমান

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "আমি তোমাকেই চাই"

বলশালী। তারা যুদ্ধ করবে। অর্জুন বয়সে ছোট, তাই তাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি; বল অর্জুন, তুমি কাকে চাও —যুদ্ধ-বিমুখ আমাকে না আমার দুর্ধর্ষ নারায়ণী সৈন্যকে?" অর্জুন উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকেই চাই। তোমাকে

যুদ্ধ করতে হবে না, তুমি আমাদের পরামর্শই দেবে। তবে আমার প্রার্থনা তোমাকে আমার সারথি হতে হবে।” শ্রীকৃষ্ণ তাতে সম্মতি দিলেন। দুর্যোধনও এতে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, “আমি নারায়ণী সৈন্য পেলেই আনন্দিত।” এর পর দুর্যোধন বলরামের কাছে গেলেন। বলরাম বললেন, “উভয় পক্ষই আমার আত্মীয় কুটুম্ব। আমি কোন পক্ষেই যোগদান করবো না।”

ভারতবর্ষের সব রাজাই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে এলেন যদু বংশের রাজা সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও অনেকে। সৈন্য সংগ্রহ হল সাত অক্ষৌহিণী। অক্ষৌহিণী সামান্য ব্যাপার নয়। কিছু কম একলক্ষ দশ হাজার পদাতিক সৈন্য, বাইশ হাজার রথ, বাইশ হাজার হাতী এবং বাইশ হাজার ঘোড়া নিয়ে সেকালে গঠিত হত এক একটি অক্ষৌহিণী।

কৌরবদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হল। তাঁদের পক্ষে যোগ দিলেন প্রাগ-জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত, মদ্র-দেশের রাজা শল্য, ভোজদেশের রাজা কৃতবর্মা, সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ এবং আরও অনেক নাম করা যোদ্ধা।

সন্ধির চেষ্টা

কিন্তু যুধিষ্ঠির চান যাতে রক্তপাত না করে রাজ্য ফিরে পাওয়া যায়। পূর্বের কথামত দ্রুপদের পুরোহিত সন্ধির

প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনায় উপস্থিত হলেন। পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি প্রবীণরা পাণ্ডবদের প্রস্তাব শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন বিবাদ না করে রাজ্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন কর্ণ। তিনি পাণ্ডবদের খুব গালাগালি করতে লাগলেন। দ্রুপদ-পুরোহিত হতাশ হয়ে ফিরে এলেন।

তার কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে। তিনি জানালেন বৃদ্ধ রাজা যুদ্ধ চান না; যুধিষ্ঠির যেন যুদ্ধের পথ থেকে নিবৃত্ত হন। যুধিষ্ঠির তাতে বললেন, "আমরা ত যুদ্ধ চাই না। তবে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে।" যুধিষ্ঠির এমন কথাও বললেন—"আমাদের পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পেলেও আমরা যুদ্ধ করব না।"

সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত জানালেন। মহামতি বিদুর অন্ধ রাজাকে বুঝিয়ে বললেন—"পাণ্ডবেরা ন্যায়সঙ্গত কথাই বলেছে। বিনাযুদ্ধে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, সেইটাই ধর্মের এবং ন্যায়ের পথ।" ভীষ্মও অনুরূপ পরামর্শ দিলেন। দ্রোণাচার্যও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন কিন্তু আপত্তি করলেন কর্ণ ও দুর্যোধন। দুর্যোধনকে বৃদ্ধ রাজা অনেক বোঝালেন, ন্যায় ও ধর্মের কথা বললেন; আর বললেন পাণ্ডবদের বিক্রম ও সহায় সম্পদের কথা। কিন্তু দুর্যোধন কিছুতেই রাজী হলেন না; দুর্যোধন যুদ্ধ করবেনই।

দুর্যোধনের এই মনোভাবে ধৃতরাষ্ট্র হতাশ হয়ে পড়লেন।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য

এখন যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য। কিন্তু শান্তিকামী যুধিষ্ঠির শেষবারের মত একটা চেষ্টা করতে চান। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকলেন পরামর্শের জন্য। কৃষ্ণ বললেন, "আমি নিজে কৌরবসভায় গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি যুদ্ধ এড়ান যায়।" এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন ভীম, অর্জুন আর নকুলও। কিন্তু যুদ্ধের অনুকূলে মত দিলেন সহদেব। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখ করে বললেন—"কৃষ্ণ! তুমি শান্তির জন্য হস্তিনায় যাচ্ছ, যাও। কিন্তু তোমরা কি ভুলে গেলে আমার প্রতি কৌরবদের অপমানের কথা? যখন তোমরা শান্তির আলোচনা করবে, তখন স্মরণ করবে আমার সেই বেণীকে—যে বেণী আকর্ষণ করে দুষ্ট দুঃশাসন আমাকে প্রকাশ্য রাজসভায় টেনে এনেছিল।"

শান্তির দূত শ্রীকৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়। হস্তিনাবাসীরা এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের আহার ও বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন নিজের রাজপুরীতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন বিদুরের কুটিরে। দরিদ্র বিদুর শ্রীকৃষ্ণের মত মাননীয় অতিথি পেয়ে তাঁর সাধ্যমত সেবা যত্ন করলেন। বিদুরের ক্ষুদ-কুঁড়ো তিনি গ্রহণ করলেন পরম আনন্দে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন কুন্তী দেবী। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলে পাঠালেন, যুদ্ধ করাই উচিত।

পরদিন সকালে রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ শান্তির প্রস্তাব জানালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এই সঙ্গে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিরাও শান্তির উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ; কিন্তু দুর্যোধন তাতে রাজী হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকেও অনেক বোঝালেন—"দুর্যোধন ! তুমি মহৎ বংশে জন্মেছ। তুমি পণ্ডিতও। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোমার নিজের ভাই বিকর্ণ—সকলেই শান্তি চাচ্ছেন। তুমি কেন এতে বাধা দিচ্ছ ? তুমি পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দাও।" দুর্যোধন তাতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী তিনি দেবেন না।* দুর্যোধন কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না দেখে ধৃতরাষ্ট্র ডেকে পাঠালেন গান্ধারীকে। গান্ধারী এলেন রাজসভায়। তিনি অন্ধ রাজাকেই দায়ী করলেন এই বিবাদের জন্য। তারপর পুত্রকে বললেন, "এখনও সময় আছে—এই পাপ-পথ থেকে ফের।" কিন্তু মাতার সকল উপদেশ ব্যর্থ হল, দুর্যোধন কোন কথা শুনলেন না। গান্ধারী অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন।

এদিকে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে গোপনে দুর্যোধন পরামর্শ করলেন, শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করবেন। কিন্তু তা সম্ভব

* যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব !
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥

হল না। সাত্যকি এই অভিসন্ধির কথা ফাঁস করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, "সুযোধন! তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন? তুমি বোধ হয় ভেবেছ আমি একা এবং নিরস্ত্র। তাই তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও!" এই বলে তিনি বিকট শব্দ করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শব্দে সকলে বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন—শ্রীকৃষ্ণের দেহেতেই রয়েছেন ব্রহ্মাদি দেবগণ, অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এবং অস্ত্রধারী কত যোদ্ধা। এই বিশ্বরূপ দেখতে পেলেন অন্ধরাজাও। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন এইটি দেখার জন্য। উপস্থিত সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন এবং প্রার্থনা করলেন তাঁর এই ভয়ঙ্কর রূপ সংবরণ করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ শান্ত হলেন। বিশ্বরূপ সংবরণ করে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধরে তিনি সভা থেকে বেরিয়ে এলেন।

কুরুবৃদ্ধেরা দুর্যোধনকে অনেক তিরস্কার করলেন। তিরস্কার করলেন ধৃতরাষ্ট্রও। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়লেন না। তাঁর সেই এক কথা। তিনি যুদ্ধ করবেনই।

হস্তিনাপুর থেকে ফেরবার পথে শ্রীকৃষ্ণ একান্ত গোপনে কর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জানালেন কর্ণের আসল পরিচয়—"কর্ণ! অধিরথ তোমার পিতা নয়—রাধাও তোমার মাতা নয়। তুমি কুন্তীদেবীর পুত্র—যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। তুমি কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের পক্ষ গ্রহণ কর; তুমিই হবে সম্রাট"। কিন্তু কর্ণ বললেন, "আমি কখনই

দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারব না। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি জীবনে কখনও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করব না।"

কুন্তীদেবীর চিন্তার শেষ নেই। তিনিও গোপনে নদীতীরে কর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন এবং কর্ণকে জানালেন তাঁর জন্মবৃত্তান্ত। কন্যা অবস্থায় সূর্যদেবকে আরাধনা করে তিনি কর্ণকে পেয়েছিলেন কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীর জলে। সারথি অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা তাকে পালন করেছেন সন্তানরূপে। প্রকৃতপক্ষে কর্ণ পাণ্ডুরই পুত্র—জ্যেষ্ঠপাণ্ডব। মাতা কুন্তী অনেক চেষ্টা করলেন কুরু-পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশা যুদ্ধ বন্ধ করতে। কিন্তু কর্ণ বললেন—"এখন তা হয় না, মা। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার পাঁচজন ছেলে জীবিত থাকবে। অর্জুন ছাড়া আমি কাউকে হত্যা করব না। হয় অর্জুন নয় কর্ণ এদের মধ্যে একজন থাকবে জীবিত আর একজন হবে নিহত।"

যুদ্ধের আয়োজন

শ্রীকৃষ্ণের শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হল। পাণ্ডবদের কাছে বিরাট রাজধানীতে তিনি ফিরে এলেন। যুদ্ধের আয়োজন চলল দ্রুতগতিতে। পাণ্ডব পক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সাত-ভাগে বিভক্ত করা হল। এক এক অক্ষৌহিণীর সেনাপতি হলেন—দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীম। সর্ব্বাধিনায়ক হলেন অর্জুন।

দুর্যোধন তাঁর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন। তিনি এক-একটি সেনাদলের সেনাপতি করলেন কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে। সকলের উপরে রইলেন পিতামহ ভীষ্ম।

দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে জানতে চাইলেন উভয়পক্ষের রথী-মহারথীদের কথা। মহারথী বা অতিরথ হিসাবে তিনি দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতির নাম করলেন। কিন্তু কর্ণের সম্বন্ধে ভীষ্ম বললেন—"কর্ণ অতিরথ নয়, এমন কি রথীও নয়—সে অর্ধরথ।" আচার্য দ্রোণও এ কথায় সায় দিলেন। কর্ণ ছিলেন কাছে দাঁড়িয়ে। অপমানে তিনি জ্বলে উঠলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি যুদ্ধ করবেন না।

যুদ্ধভূমি কুরুক্ষেত্রের পূবদিকে শিবির পড়ল কৌরবদের। আর পশ্চিমদিকে রইলেন পাণ্ডবসেনারা। কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যগণ নিজেরা পৃথক পৃথক বেশ এবং চিহ্ন ধারণ করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চাইলেন যাতে অন্ধরাজা প্রাসাদে বসেই যুদ্ধক্ষেত্রের সব কিছু দেখতে পান। বৃদ্ধরাজা আত্মঘাতী এই যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে চাইলেন না। ব্যাসদেব তাই দিব্যচক্ষু দান করলেন সঞ্জয়কে। সঞ্জয় ঘরে বসে সেই যুদ্ধের সব খবর জানতে পারবেন এবং দেখতেও পাবেন সব কিছু।

ভীষ্ম পর্ব

অর্জুনের বিষাদ

যুদ্ধের জন্য উভয়পক্ষ প্রস্তুত। স্নান করে পবিত্র হয়ে উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন; যেন দুটি সৈন্য-সমুদ্র গর্জন করতে করতে উভয় দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ কতগুলি নিয়ম স্থির করে নিলেন। দিনের মধ্যে যুদ্ধ হবে; সূর্য অস্ত গেলে আর যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে; রথীর সঙ্গে রথীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর। যে যুদ্ধে বিমুখ, যে অস্ত্রহীন বা যার বর্ম নেই, তাকে অস্ত্রাঘাত করা চলবে না। সারথি, ভারবাহী, অস্ত্রের যোগানদার, পতাকাবাহী—এদের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ নিষিদ্ধ।

দুর্যোধন নিজ পক্ষের রাজাদের কাছে ঘোষণা করলেন—"পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সর্বাধিনায়ক—আপনারা সকল দিক থেকে তাঁকে সাহায্য করুন।" মহামতি ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে তাঁর রণশঙ্খ বাজালেন। কৌরব-শিবিরে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল শত শত তুরী, ভেরী, ঢাক ও ঢোল।

এদিকে একটি সুন্দর রথে বসেছেন অর্জুন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরাও উচ্চনিনাদে নিজ নিজ শঙ্খ

বাজালেন। উভয়পক্ষের মিলিত শঙ্খধ্বনি এবং সৈন্যদের কোলাহলে সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

অর্জুন তখন কৃষ্ণকে বললেন, "হে কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষের মাঝখানে একবার আমার রথ নিয়ে চল। একবার ভাল করে দেখি কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।"

পার্থসারথি রথ নিয়ে রাখলেন উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে। অর্জুন দেখলেন সবাই আপনজন—পিতামহ, আচার্য প্রভৃতি। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি করুণ স্বরে বললেন, "কৃষ্ণ, আমি এ যুদ্ধ করব না। দরকার নেই আমাদের রাজা হওয়ার। সারা পৃথিবীর লোভেও আমি এদের হত্যা করতে পারব না। এঁরা যে আমার একান্ত আপনার জন। আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না, সুখ-সম্পদে আমার দরকার নেই।" এই বলে তিনি গাণ্ডীব ত্যাগ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভরসা দিয়ে বললেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। তুমি কাপুরুষ হয়ো না। হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ কর। ওঠ, যুদ্ধ কর।" কিন্তু অর্জুন উত্তরে বললেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহানুভব গুরুজনদের আমি বধ করব কি করে? স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও আমি তা পারব না।" কৃষ্ণ বোঝাতে লাগলেন

অর্জুনকে "দেহ তুচ্ছ বস্তু। কারণ দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেহের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাই হলো জীবের প্রকৃত

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"ওঠ অর্জুন, যুদ্ধ কর।"

সত্ত্বা। আত্মার মৃত্যু নেই। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। কাপড় জীর্ণ হয়ে গেলে যেমন তা ফেলে দিয়ে মানুষ আর একখানি নূতন কাপড় পরে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেলে আত্মা তেমনি একটি নতুন দেহ গ্রহণ করে।"*

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, "অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়। পাপের

---

* বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি॥

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই তোমার ধর্ম। সে ধর্ম লঙ্ঘন করো না। তাছাড়া ফলাফলের দিকে তাকিয়ো না। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলাফলে নয়। ফলাফল ভগবানের হাতে অর্পণ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ এই সময় অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। অর্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর সারথি, তাঁর সখা—সামান্য মানুষ নন। তিনি স্বয়ং ভগবান। পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তাঁর বিরাট দেহের অংশ মাত্র। সমস্ত জলধারা যেমন সীমাহীন সমুদ্রে গিয়ে মেশে, সমস্ত প্রাণীর জীবন ধারা তেমনি বিরাট বিশ্ব দেবতায় লীন হয়। আর সেই বিশ্বদেবতা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অর্জুন হাতজোড় করে বললেন, "আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। তোমার দয়ায় আমার সে মোহ নষ্ট হয়েছে। আমি যুদ্ধ করব।" নতুন উদ্যমে তিনি শরাসন নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য শ্রীভগবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়েছিলেন—তাই পরে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

যুদ্ধারম্ভ

যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষের সেনাপতিরা ব্যূহ রচনা করেছেন। এর মাঝখানে দেখা গেল যুধিষ্ঠির তাঁর ধনু ত্যাগ করে, বর্ম

খুলে খালি হাতে শত্রু সৈন্যের ভেতর অগ্রসর হতে লাগলেন। পাণ্ডবেরা বিস্মিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করে বললেন, "পিতামহ! যুদ্ধের পূর্বে আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

ভীষ্ম বললেন, "যুধিষ্ঠির! তুমি যদি আজ এভাবে না আসতে তবে আমি রুষ্ট হতাম। তুমি আসায় আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি দুর্যোধনের অন্নদাস—তাই আজ আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তুমি জেনো, ধর্ম তোমাদের পক্ষে। তোমাদের জয় অনিবার্য। কুরু পক্ষে যত দুর্ধর্ষ বীর থাকুন না কেন, তোমরা সেজন্য ভীত হয়ো না।"

দ্রোণ এবং কৃপের কাছেও গেলেন যুধিষ্ঠির। তাঁরাও এই কথাই বললেন—দুর্যোধনের অন্নদাস বলে তাঁদের এই যুদ্ধ করতে হচ্ছে কৌরবদের পক্ষ নিয়ে। কিন্তু তাঁরা আশীর্বাদ করছেন—পাণ্ডবদের জয় হোক। শল্যকেও যুধিষ্ঠির প্রণাম জানালেন। 'তোমাদের জয় হোক'—বলে শল্য আশীর্বাদ করলেন। তারপর কুরু পক্ষের সকলকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করতে চান, তাঁরা চলে আসুন।" দুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই যুযুৎসু এলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে।

তারপর আরম্ভ হল ভীষণ যুদ্ধ। বীরবিক্রমে কুরুপাণ্ডব বীরগণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃতদেহে ভরে গেল রণাঙ্গন। এমন সময় মদ্ররাজ শল্যের শরে নিহত

হলেন বিরাট-পুত্র উত্তর। প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন উত্তরের ভ্রাতা শ্বেত। শ্বেতের আক্রমণে শল্য বিপন্ন হয়ে পড়লেন। শত শত কৌরব সৈন্য নিহত হল। অবশেষে শ্বেতকে বধ করে ভীষ্ম শল্যকে রক্ষা করলেন। দিনমণি অস্ত গেল। প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয় দিন কৌরব পক্ষের অনেক সৈন্য নিহত হল। ভীমার্জুনের বিক্রমে ভীষ্ম স্তম্ভিত হলেন। তিনিও বধ করলেন পাণ্ডব পক্ষের দশ সহস্র সৈন্য।

তৃতীয় দিবসের সংগ্রাম আরও ভীষণতর। ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। চিরশত্রু দুজন আজ প্রবল বেগে একে অপরকে আক্রমণ করছেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধন রথের উপর অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তাঁর সারথি তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে নিয়ে পালিয়ে গেল। নতুবা হয়তো সেই দিনই দুর্যোধনের প্রাণ যেত।

চৈতন্য পেয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে অভিযোগ করলেন, "পিতামহ! আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। তাই আপনাকে সেনাপতি পদে বরণ করেছি। দ্রোণ ও কৃপের মতো মহারথীরা আমার সহায়। তবুও পাণ্ডবদের বিক্রমে আমরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করছি। নিশ্চয়ই আপনারা ঠিক ঠিক যুদ্ধ করছেন না। আগে যদি জানতাম আপনারা এমন করবেন—তবে কর্ণকেই করতাম সেনাপতি।"

ক্ষোভে ও অপমানে জ্বলে উঠলেন ভীষ্ম। দুর্যোধনকে

তিনি জানালেন—"পাণ্ডবদের জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। একথা অনেকবারই আমরা বলেছি। কিন্তু তুমি আমাদের সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করেছ। তাছাড়া আমি তো বৃদ্ধ!" এই বলে প্রচণ্ড তেজে ভীষ্ম সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। সে প্রবল পরাক্রমের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য! পাণ্ডবসৈন্য শীঘ্রই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অর্জুন ছুটে এলেন প্রতিরোধের জন্য; কিন্তু পিতামহের গায়ে কঠিন অস্ত্র নিক্ষেপ করতে কেমন যেন মায়া হোল অর্জুনের। তিনি মৃদুভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

তাই দেখে বিপদ গণলেন সারথি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু আজ তাঁরই সামনে পাণ্ডবেরা যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছেন। তাই তিনি সুদর্শন চক্র হাতে নিলেন; ভীষ্মকে বধ করার জন্য রথ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন ভীষণ বেগে।

ভীষ্ম ভীত হলেন না; অস্ত্র নিক্ষেপ বন্ধ রেখে বললেন, "এস পুরুষোত্তম! তুমি বধ কর আমাকে। তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, সে ত আমার পরম ভাগ্য। শুধু ইহলোক নয় পরলোকেও আমি ধন্য হব।"

শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে দেখে অর্জুন লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে ছুটে

গিয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন আর তিনি মৃদুভাবে যুদ্ধ করবেন না। কৃষ্ণ এতে শান্ত হলেন। আবার রথে বসে তিনি অশ্বচালনা করতে লাগলেন। এদিনের যুদ্ধে অর্জুন ধ্বংস করলেন দশহাজার কৌরব সৈন্য।

ভীষ্মের শরশয্যা

চতুর্থ দিনে ভীমের হাতে প্রাণ হারালো দুর্যোধনের আট জন ভ্রাতা। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ এদিন মায়াযুদ্ধ বলে কৌরব সৈন্য বহু ধ্বংস করেছিলেন। পঞ্চমদিন ভীষ্ম ও ভুরিশ্রবা খুব যুদ্ধ করেছিলেন, তবুও অর্জুনের হাতে কৌরবদের পঁচিশ হাজার সৈন্য নিহত হল।

ষষ্ঠ দিনে ভীমের হাতে দুর্যোধনের দুর্দশা চরমে উঠল। তাঁর ধনু কাটা গেল, সারথি নিহত হল, রথের ঘোড়াগুলি হল হত। তিনি নিজে মূর্চ্ছা গেলেন। কৃপাচার্য ছুটে এসে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। এইদিন দ্রৌপদীর পুত্রেরা এবং সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু বিশেষ বিক্রম দেখালেন। চিত্রসেন প্রভৃতি দুর্যোধনের আট ভ্রাতাকে অভিমন্যু বাণবিদ্ধ করলেন। আর দুষ্কর্ণ, জয়ৎসেন প্রভৃতিকে বিপর্যস্ত করলেন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র।

সপ্তমদিনে দ্রোণাচার্য মারলেন বিরাটের পুত্র শঙ্খকে। অষ্টম দিনে ভীমের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের চব্বিশ জন পুত্র নিহত হলেন।

নবমদিনে ভীষ্মের হাতে বহু পাণ্ডব সৈন্য ও বীর প্রাণ হারালেন। পাণ্ডব সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মহারথীরাও ভয়ে পালাতে লাগলেন। পাণ্ডব শিবিরে হাহাকার পড়ে গেল। বিশেষ চিন্তিত হলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর মনে পড়ল পিতামহ বলেছিলেন বিপদের সময় পাণ্ডবদের তিনি উপযুক্ত মন্ত্রণা দেবেন। রাত্রিতে নিরস্ত্র পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন ভীষ্মের কাছে। পিতামহকে প্রণাম জানিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি আমাদের জয়ের আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু সে জয় কি করে সম্ভব হবে? আমরা ত ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ছি।" একটু হেসে ভীষ্ম বললেন, "ঠিক বলেছ যুধিষ্ঠির! আমি যতক্ষণ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব ততক্ষণ তোমাদের জয়ের আশা নেই। যদি আমাকে নিরস্ত্র করতে পার তবেই তোমাদের জয় হবে। তোমাদের জয়ের উপায় আমি বলে দিচ্ছি। কালকের যুদ্ধে দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ কর। শিখণ্ডী জন্মের সময় কন্যারূপেই জন্মেছিল। আজ সে পুরুষ হলেও আমি তাকে নারী বলে গণ্য করি—আর স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অন্যায়। তাই শিখণ্ডীকে সামনে রেখে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে।"

নিজের বধের উপায় ভীষ্ম নিজেই বলে দিলেন। মহারথী শিখণ্ডীকে সামনে রেখে দশম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। পেছন থেকে অর্জুন অবিরাম তীর বর্ষণ করছেন। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ

তীর এসে ভীষ্মের সমস্ত দেহকে জর্জরিত করতে লাগল কিন্তু ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখে অস্ত্র সংবরণ করলেন। পিতামহের সর্বদেহ তীরে তীরময় হয়ে গেল। তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

পিতামহ শিখণ্ডীকে দেখে অস্ত্র সংবরণ করলেন

আকাশের সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে, কৌরবকুলের গৌরবসূর্যও অস্তমিত হল। ভীষ্ম সেই সমস্ত শর গায়ে নিয়ে ভূতলে পতিত হলেন। সেদিনকার মত যুদ্ধ শেষ হল।

ভীষ্মের পতনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের রথী মহারথী সকলে ম্রিয়মাণ হলেন। বর্ম ত্যাগ করে উভয়পক্ষের রাজারা ছুটে এলেন ভূতলশায়ী মহাবীরের কাছে।

ভীষ্মের দেহের বাণগুলি তাঁর দেহকে মাটি থেকে

খানিকটা উপরেই রেখেছে। তবে মাথাটিতে কোন বাণ ছিল না বলে তা ঝুলে পড়েছিল। তাই তিনি একটি উপাধান চাইলেন। দুর্যোধন তাড়াতাড়ি কয়েকটি কোমল বালিশ আনলেন। ভীষ্মদেব সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনকে বললেন, "অর্জুন! বীরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দিতে পার?"

অর্জুন গাণ্ডীব নিলেন হাতে; তিনটি বাণ ছুঁড়লেন। সেগুলি ভীষ্মের মস্তকটিকে স্থিরভাবে ধারণ করল। পিতামহ সন্তুষ্ট হলেন।

পিতা শান্তনুর কাছে ভীষ্ম পেয়েছিলেন ইচ্ছামৃত্যু বর। তিনি সমাগত বীরদের বললেন—"এখন দক্ষিণায়ন—এখন আমি এই শরশয্যায় থাকব। উত্তরায়ণে হবে আমার মৃত্যু।"

পরদিন প্রভাতে সবাই আবার এলেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম বললেন, "আমার খুব তেষ্টা পাচ্ছে। একটু জল দাও।" দুর্যোধন ও দুঃশাসন তাড়াতাড়ি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল ও স্বর্ণপাত্রে খাবার আনলেন। ভীষ্ম সেগুলি কিছুই গ্রহণ করলেন না; শুধু অর্জুনকে কাছে ডেকে বললেন—"আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে; একটু জল দিতে পার?" অর্জুন তখন ধনুঃশর নিয়ে পৃথিবী বিদ্ধ করলেন; পাতাল থেকে উঠল অমৃতধারা। তা পান করে তৃপ্ত হলেন ভীষ্ম। তিনি অর্জুনকে আশীর্বাদ করলেন, "তুমি বিজয়ী হও, অর্জুন।" তারপর ভীষ্ম দুর্যোধনকে কাছে ডাকলেন—অনেক বোঝালেন তাঁকে। "এখনও বলছি দুর্যোধন! যুদ্ধ বন্ধ কর। রাজ্য ফিরিয়ে দাও

পাণ্ডবদের। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি আমার মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়ে যাক।”

মুমূর্ষু কি কখনও ঔষধ খেতে চায়? দুর্যোধনও শুনলেন না—পিতামহের এই হিতকর বাক্য।

কর্ণ এলেন। তিনি অভিমান ভরে বললেন—“পিতামহ আপনি আমাকে কোনদিন ভাল ভাবে দেখলেন না, এই দুঃখ আমার রয়ে গেল।” পরম স্নেহে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, “কর্ণ, কেউই আমার দ্বেষের পাত্র নয়। তুমি অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে প্ররোচিত করতে। তাই তোমাকে গালি মন্দ করেছি। তাছাড়া তুমি ত জান—তুমি কুন্তীর পুত্র, তুমি অধিরথের পুত্র নও। তুমি এ যুদ্ধ বন্ধ কর।”

কর্ণ বললেন, “আমি সব জানি পিতামহ! কিন্তু দুর্যোধনকে কথা দিয়েছি তাকে আমি সর্বভাবে রক্ষা করব। এখন তাকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমাকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিন।” এখানে বলা দরকার, যুদ্ধ আরম্ভের সময় কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ভীষ্ম যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুদ্ধ করবেন না।

ভীষ্ম কর্ণকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন—“নিতান্তই যদি তুমি কৌরব পক্ষ ত্যাগ করতে না পার তবে তুমি স্বর্গলাভের কামনায় যুদ্ধ কর।” ভীষ্মকে প্রণাম করে কর্ণ সজল নয়নে বিদায় নিলেন।

দ্রোণ পর্ব

যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার চেষ্টা

ভীষ্মের পতনের পর দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। তুমুল শব্দে দুন্দুভি বেজে উঠল। একাদশ দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন আচার্যকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে প্রাণে না মেরে তাঁকে বন্দী করেন। তাতে দ্রোণ হেসে বললেন—"তুমিও তাহলে ধর্মরাজের মৃত্যু কামনা কর না। সত্যই এই পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের শত্রু কেউ নেই।" দুর্যোধন তার উত্তরে বললেন—"তা ঠিক, যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু আমি চাই না। তবে তাঁকে যদি আর একবার দ্যূতক্রীড়ায় বসান যায় তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহলে আবার আমরা পাণ্ডবদের বার বছর বনবাসে পাঠাতে পারব।" কিন্তু অর্জুন এইদিন এমন যুদ্ধ করলেন যে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রোণ পারলেন না যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে।

দ্বাদশ দিনের আরম্ভেই দ্রোণ দুর্যোধনকে ডেকে বললেন—"তোমরা অর্জুনকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিতে না পারলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা যাবে না।" যুদ্ধ আরম্ভ হল। ত্রিগর্তের রাজা সুশর্মা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অর্জুন যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন, "পাঞ্চালের রাজা সত্যজিৎ আজ থাকবেন আপনার রক্ষণাবেক্ষণে।

সত্যজিৎ যদি নিহত হন তবে আপনি যেন আর যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকেন।" অর্জুন ত্রিগর্ত রাজার সংগে যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই সুযোগে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার জন্য ব্যূহ রচনা করলেন সেনাপতি দ্রোণ। কিন্তু যুধিষ্ঠির অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ভীম প্রবল বেগে বাধা দিতে লাগলেন দ্রোণকে। কৌরব পক্ষীয় ভগদত্ত প্রকাণ্ড এক হাতীতে চড়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন দূর থেকে তাই দেখে ছুটে এলেন ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভগদত্ত তখন তাঁর বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অর্জুনের দিকে।

এই অস্ত্র অতি ভয়ানক। স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কারুর পক্ষে এর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণ তাই এগিয়ে গিয়ে অর্জুনকে আড়াল করে রাখলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র লাগল কৃষ্ণের বুকে। তখন এক মজার ব্যাপার ঘটল। ঐ অস্ত্র কৃষ্ণের গলায় মালা হয়ে দুলতে লাগল। অর্জুন রক্ষা পেলেন। তারপর তিনি অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকে বধ করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। দ্রোণ আর এদিন যুধিষ্ঠিরের কিছু করতে পারলেন না। সূর্য অস্ত গেল। ক্লান্ত মহারথীরা সসৈন্যে ফিরে গেলেন যে যার শিবিরে।

অভিমন্যু বধ

মহাবীর দ্রোণ দ্বিতীয় দিনেও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না। দুর্যোধন তখন অভিযোগ করলেন, "আচার্য যুধিষ্ঠিরকে

বন্দী করতে পারেন না একথা আমি বিশ্বাস করি না। ইচ্ছা করলেই যুধিষ্ঠিরকে আপনি বন্দী করতে পারেন।”

দ্রোণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন একজন না একজন মহারথীকে তিনি আজ বধ করবেন।

যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিন। দ্রোণের সেনাপতিত্বের এটি তৃতীয় দিবস। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন। এ ব্যূহ ভেদ করার উপায় জানতেন অর্জুন। অভিমন্যুও জানতেন ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে। কিন্তু বেরিয়ে আসার কৌশল তাঁর জানা ছিল না। দ্রোণাচার্য কৌশলে অর্জুনকে সরিয়ে দিলেন মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সংশপ্তক নামে বীর যোদ্ধারা অর্জুনকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। আচার্য পাণ্ডবদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে প্রচুর সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন ভীষণ বিপদ। তিনি নিরুপায় হয়ে কিশোর বীর অভিমন্যুকে অনুরোধ করলেন এ ব্যূহ ভেদ করার জন্যে। অভিমন্যু বললেন, “ব্যূহ ভেদ করার কৌশল পিতা আমাকে শিখিয়েছেন কিন্তু বেরিয়ে আসার কৌশলতো আমার জানা নেই।”

যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। কিন্তু অন্য কোন উপায় না দেখে তিনি বললেন, “অভিমন্যু! তুমি প্রবেশ পথ একবার খুলে দিলে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব। ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং আমরা সকলে তোমাকে বিভিন্ন দিক থেকে রক্ষা করব।”

পাণ্ডবদের নয়নের মণি, পরম স্নেহের ধন, ষোল বছরের তরুণ বীর অভিমন্যু প্রবল বেগে চক্রব্যূহ ভেদ করলেন। সিংহ যেমন বিনাশ করে হাতীর দলকে, তেমনি করে তিনি বিনাশ করতে লাগলেন কুরু সৈন্যদের। দ্রোণাচার্য খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তবে মনে মনে খুব খুশীও হলেন। পিতার যোগ্যপুত্র বটে অভিমন্যু। কিন্তু ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা অভিমন্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না। বাধা দিলেন জয়দ্রথ। জয়দ্রথ

একা অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যে

মহাদেবের বরে আজ অজেয়। তিনি বর পেয়েছিলেন পার্থ বাদে বাকী পাণ্ডবদের তিনি একদিনের জন্য পরাস্ত করতে

পারবেন। এদিকে একা অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যে। কিন্তু তবু তাঁর বিক্রমে সকল কৌরববীর বিস্মিত। দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য প্রভৃতি সকলে মিলিত হয়েও অভিমন্যুর সঙ্গে পেরে উঠছেন না। অভিমন্যুর শরে শল্য ও কর্ণ মূর্চ্ছিত। সংজ্ঞাহীন দুঃশাসনকে নিয়ে তাঁর সারথি রণে ভঙ্গ দিল। অভিমন্যু সমস্ত কুরু সৈন্যকে বিপর্যস্ত করে ফেললেন। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণকে সামনে পেয়ে অভিমন্যু এক ধারাল অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। সে আঘাতে প্রাণ হারালেন দুর্যোধন-পুত্র। দুর্যোধন তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন! যেমন করে হোক আজ অভিমন্যুকে বধ করতে হবে। যুদ্ধের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, শকুনি ও কৃপাচার্য ছ'জন মহারথী* এক সঙ্গে আক্রমণ করলেন অভিমন্যুকে। অভিমন্যু একাকী তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগালেন বীরবিক্রমে।

বিপন্ন হয়ে দ্রোণ ইঙ্গিত করলেন কর্ণকে। দ্রোণের ইঙ্গিতে কর্ণ পেছন থেকে অভিমন্যুর ধনু ও রথ ছিন্ন করে ফেললেন। রথ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে খড়্গ নিয়ে অভিমন্যু তখন মহারথীদের আক্রমণ করলেন। দ্রোণ তাঁর খড়্গ কেটে ফেললেন। অভিমন্যু কি আর করবেন! ভাঙ্গা রথের চাকা নিয়েই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু কতক্ষণ

---

* অন্যমতে দুঃশাসনকে নিয়ে সাতজন মহারথী।

লড়বেন এই অবস্থায়? অভিমন্যু নিহত হলেন। দিনের শেষে অস্তমিত সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত গেল ভারতের তরুণ বীর অভিমন্যু।

জয়দ্রথ বধ

সন্ধ্যায় শিবিরে ফিরে অর্জুন শুনলেন নিদারুণ সংবাদ। অন্যায় যুদ্ধে কৌরব-মহারথীরা অভিমন্যুকে বধ করেছেন। শোকে কাতর অর্জুন আরও শুনলেন জয়দ্রথ এই সর্বনাশের মূলে। জয়দ্রথের জন্যই ভীম প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি। অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, "কাল সূর্যাস্তের মধ্যে যদি পাষণ্ড জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি তবে নিজে প্রবেশ করব অগ্নিকুণ্ডে।" শোকাতুরা সুভদ্রা বিলাপ করলেন সারারাত। পাণ্ডবেরা সকলেই বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। কৌরব শিবিরেও কারুর ঘুম নেই। অর্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা কৌরবেরা শুনেছেন। জয়দ্রথের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁরা এখন বিশেষ উদ্বিগ্ন।

প্রভাত হল। দ্রোণাচার্য জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য প্রথমে রচনা করলেন চক্রশকট ব্যূহ। তারপর পদ্মব্যূহ; আবার তারও মধ্যে রচনা করলেন সূচীব্যূহ। এতগুলি ব্যূহ রচনা করে জয়দ্রথকে রাখলেন তার অন্তরালে। সারাদিন যুদ্ধ করেও গাণ্ডীবী সন্ধান পেলেন না জয়দ্রথের।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। অর্জুনকে তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা

অনুযায়ী এবার অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে হয়! এ বিপদে সহায় হলেন বিপদবারণ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তখন নিজের মায়ার দ্বারা সূর্যকে ঢেকে ফেললেন। দিগন্তে অন্ধকার দেখা দিল। কৌরবেরা ভাবলেন সূর্য অস্ত গেছে। তাঁদের তখন কি উল্লাস! অস্ত্রত্যাগ করে সকলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

জয়দ্রথও ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে পার্থকে বললেন, "এই যে বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ! এইবার অগ্নিতে প্রবেশ কর।" অর্জুন কোন উত্তর দিলেন না; তখন কথা বলার সময়ও নেই। জয়দ্রথকে পাওয়া গেছে—এখন তাকে হত্যা করতে হবে। এমন সময় কৃষ্ণ বললেন, "সাবধান অর্জুন, জয়দ্রথের মাথা যেন মাটিতে না পড়ে। যে ঐ মাথা মাটিতে ফেলবে তার মাথাও সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে দেহ থেকে।" তাই বাণে বাণে উড়িয়ে জয়দ্রথের মাথাকে অর্জুন নিয়ে চললেন সেখানে, যেখানে জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র বনে তপস্যা করছেন। সহসা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে এসে পড়ল জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তকটি। বিস্মিত হয়ে তিনি আসন ত্যাগ করলেন আর মাথাটিও কোল থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের মাথাও হল দেহচ্যুত। জয়দ্রথ ও তাঁর পিতা একই সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। জয়দ্রথ বধের পর সূর্যের আবরণ সরে গেল। সবাই দেখল শ্রীকৃষ্ণের দৈবী মায়া; সূর্য তখনও পশ্চিম আকাশে দীপ্তিমান।

নিশাযুদ্ধ ও ঘটোৎকচ বধ

জয়দ্রথ বধ হল। কৌরব শিবিরে বড় নৈরাশ্য। দুর্যোধন দ্রোণকে সখেদে বললেন, "অর্জুন আপনার প্রিয়তম শিষ্য। আপনি তাই ইচ্ছা করে আমাদের পরাজয় ঘটাচ্ছেন।"

আচার্য তিরস্কার করলেন দুর্যোধনকে, "প্রাণপণ যুদ্ধ করছি, আমি, তবু তোমার অবিশ্বাস।" খুবই অপমানিত বোধ করলেন দ্রোণাচার্য। রাগে ও ক্ষোভে তিনি আদেশ দিলেন "আজ এখন যুদ্ধ বন্ধ হবে না। রাত্রিতেও যুদ্ধ চলবে।" কুরুসৈন্য রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ করলেন পাণ্ডব সৈন্যদের। অন্ধকারে কে কাকে মারছে তা বোঝা যাচ্ছে না; পরে পদাতিকরা প্রদীপ জ্বেলে রণভূমি আলোকিত করল। সারা-রাত চলল যুদ্ধ। এই নিশাযুদ্ধে কৌরবপক্ষেরই সৈন্যনাশ হতে লাগল বেশী।

ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ এল প্রচণ্ড বেগে। তার প্রতাপে মহাবীর কর্ণও নিজেকে বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। ঘটোৎকচের জননী ছিল হিড়িম্বা রাক্ষসী। রাক্ষসীমায়া অবলম্বন করে সে আজ কুরু সৈন্য ধ্বংস করতে লাগল। কর্ণ সব সময় সঙ্গে রাখতেন ইন্দ্রের দেওয়া একাঘ্নী অস্ত্র। এই অস্ত্র তিনি রেখেছিলেন অর্জুনকে মারবার জন্য। কিন্তু ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরব পক্ষ সমূলে ধ্বংস হতে চলেছে। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করলেন

সেই শক্তি-বাণ। একাঘ্নী বাণ ঘটোৎকচকে বধ করে একটি উজ্জ্বল তারকার মত ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেল।

ঘটোৎকচ বধে শোকার্ত হলেন পাণ্ডবেরা; বিশেষত পিতা ভীমসেন। কিন্তু আনন্দে নাচতে লাগলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের এই ব্যবহারে সকলে দুঃখিত হলেন। কৃষ্ণ তখন বললেন "আজ যদি একাঘ্নী অস্ত্র দিয়ে কর্ণ ঘটোৎকচকে বধ না করত তবে অর্জুন নিহত হত এই অস্ত্রে। সে আশঙ্কা আর রইল না।"

দ্রোণ বধ

নিশাযুদ্ধে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অর্জুন প্রস্তাব করলেন যে পর্যন্ত চন্দ্রের উদয় না হয় ততক্ষণ সকলে বিশ্রাম করুক। উভয়পক্ষের সৈন্যরা অর্জুনের এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলেন। তারা যে যেখানে ছিল সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় রণক্ষেত্র আলোকিত হলো। আরম্ভ হল তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধের আর বিরাম নাই। এই নিশাযুদ্ধে দ্রোণ হত্যা করলেন মহাবীর দ্রুপদ ও বিরাটকে; আর ধ্বংস করলেন অগণিত সৈন্য।

প্রভাত হল। একটানা যুদ্ধ চলছে। দ্রোণ যেভাবে পাণ্ডবদের শক্তিক্ষয় করছেন তা দেখে সকলে চিন্তিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন "দ্রোণকে নিরস্ত্র না করলে আজ পাণ্ডবদের নিস্তার নেই। আর যে পর্যন্ত দ্রোণ নিজে অস্ত্র ত্যাগ না করছেন সে পর্যন্ত তাঁকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব।" কিন্তু দ্রোণ কেন স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করবেন? শ্রীকৃষ্ণ জানালেন, "এটি সম্ভব হতে পারে তখনই, যখন তিনি শুনবেন তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ। তোমরা এর উপযুক্ত ব্যবস্থা কর।"

মালবরাজের একটি হাতী ছিল। তারও নাম অশ্বত্থামা। ভীম তাকে মেরে এসে দ্রোণের নিকট গিয়ে বললেন—"অশ্বত্থামা হত হয়েছে।"

দ্রোণ বললেন, "আমি একথা বিশ্বাস করি না; সত্যবাদী যুধিষ্ঠির যদি বলে তবেই আমি বিশ্বাস করব।"

ভাইদের অনুরোধে এবং কৃষ্ণের আদেশে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে খুব চিৎকার করে বললেন—"অশ্বত্থামা হতঃ" (অশ্বত্থামা হত হয়েছে) কিন্তু খুব নিম্ন স্বরে বললেন—ইতি কুঞ্জরঃ (এই নামে একটা হাতী)। যুদ্ধের কোলাহলে 'ইতি কুঞ্জরঃ' কথাটি শুনতে পেলেন না দ্রোণ। পুত্রশোকে অধীর হয়ে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই অবসরে খড়্গ দ্বারা দ্রোণের শিরচ্ছেদ করলেন।

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুসংবাদ শুনে অশ্বত্থামা ছুটে এলেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

দ্রোণ নারায়ণের সেবা করে 'নারায়ণী' অস্ত্র লাভ করেছিলেন। সে অস্ত্র তিনি দিয়েছিলেন পুত্র অশ্বত্থামাকে।

অস্ত্রটি খুবই শক্তিশালী ছিল। যার প্রতি এটি প্রয়োগ করা হবে তার আর নিস্তার থাকবে না যদি না সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ত্র ত্যাগ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। শোকে অধীর হয়ে অশ্বত্থামা সেই অদ্ভুত শক্তিময় নারায়ণী অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। পৃথিবী সহসা কেঁপে উঠল। ঐ অস্ত্র উল্কার মত ছুটে এল পাণ্ডবদের গ্রাস করতে। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে সমস্ত পাণ্ডব রথী-মহারথীরা অস্ত্র ত্যাগ করে ভূমিতে লাফিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভীম কিছুতেই অস্ত্রত্যাগ করবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ছুটে গিয়ে ভীমের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন; কাজেই নারায়ণী অস্ত্র বিফল হল।

দুর্যোধন অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামাকে পুনরায় নারায়ণী অস্ত্র প্রয়োগ করতে। কিন্তু অশ্বত্থামা বললেন, "তার আর উপায় নেই। এই অস্ত্র একবারের বেশী প্রয়োগ করা যায় না। দ্বিতীয়বার যে প্রয়োগ করবে, ঐ অস্ত্রে তার নিজের মৃত্যু হবে। কৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবেরা আজ বেঁচে গেল—আমরা পরাস্ত হলাম।"

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে কৌরব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পাণ্ডবদের জয়ের আশা হল উজ্জ্বল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পনের দিন গত হল।

কর্ণ পর্ব

শল্যের সারথ্য

দ্রোণাচার্যের পর কুরুপক্ষে সেনাপতি পদে বৃত হলেন মহাবীর কর্ণ। দুর্যোধন তাঁকে বললেন, "পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ উভয়েরই পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত ছিল। তোমার সে দুর্বলতা নাই। তুমি আমার পরম বন্ধু, তুমি সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।"

ষোড়শ দিনের যুদ্ধ পরিচালনা করলেন কর্ণ। ভীম প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করলেন অশ্বত্থামাকে। অশ্বত্থামাও শরাঘাতে ভীমকে অস্থির করে তুললেন। অর্জুনের সঙ্গেও তার যুদ্ধ হল। পরাজিত হয়ে অশ্বত্থামা রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। এদিনে যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের মধ্যেও প্রবল যুদ্ধ হল এবং তাতে দুর্যোধন বারে বারে হেরে গেলেন। অর্জুনের শরাঘাতে বহু কুরুসৈন্য ধ্বংস হল। অবশেষে সূর্যাস্তের সংগে বন্ধ হল এদিনের যুদ্ধ।

পরের দিন কর্ণ বললেন, "অর্জুন আমার থেকে বড় বীর নয়—কিন্তু তার সারথি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। আমি যদি আমার যোগ্য সারথি পাই তবে প্রতিজ্ঞা করছি অর্জুনকে আমি বধ করবই।" কৌরব পক্ষে শল্য হলেন কৃষ্ণের তুল্য সারথি। দুর্যোধন তাঁকে অনুরোধ করলেন কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করতে।

মদ্ররাজ শল্য এতে অপমানিত বোধ করলেন। তিনি

বললেন—"আমি রাজা। আমি কেন সূতপুত্র কর্ণের সারথি হতে যাব? বরং আমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছি—আমি আর যুদ্ধ করব না।" কিন্তু দুর্যোধনের বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শল্য রাজী হলেন সারথি হতে।

শল্যকে সারথি করে কর্ণ প্রবেশ করলেন রণক্ষেত্রে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। পৃথিবী কেঁপে উঠল ভীষণ শব্দে; আকাশ থেকে উল্কাপাত হল। বিনামেঘে হল বজ্রপাত। পশুপক্ষী ভয়ে ভীত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে চলল।

কর্ণ আস্ফালন করে বলতে লাগলেন, "অর্জুনের সন্ধান যে দেবে তাকে আমি প্রচুর উপহার দেব।" সারথি শল্য কিন্তু বাধা দিয়ে বললেন "আগুনে পুড়ে মরবার জন্যই পতঙ্গ আগুনকে আহ্বান করে। মৃগশিশু সিংহকে আহ্বান করে নিজের বিনাশের জন্যে। কর্ণ! আজ তুমিও অর্জুনকে আহ্বান করছ নিজের মৃত্যুর জন্য।"

শল্য ছিলেন যুধিষ্ঠিরের মাতুল। পাণ্ডবদলেই তাঁর যোগদানের কথা। কিন্তু দুর্যোধন কৌশলে সসৈন্য শল্যকে লাভ করলেন নিজের দলে। যুধিষ্ঠির এতে দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু শল্য তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যেমন করে হোক তিনি পাণ্ডবদের সাহায্য করবেন।

আজ সে সুযোগ এসেছে। তিনি কর্ণের নিন্দা ও পাণ্ডবদের প্রশংসা করে কর্ণের মন খারাপ করে দিলেন। পাণ্ডবদের প্রশংসা শুনে কর্ণ খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি

শল্যের কাছে নিজের খুবই বড়াই করতে লাগলেন। সংগে সংগে একথাও কর্ণ বললেন—"কি করব! গুরুর অভিশাপ; কার্যকালে মহাস্ত্রগুলির কথা আমার মনে পড়বে না। তা না হলে আমি পাণ্ডবদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।" এই নিয়ে কর্ণের সংগে বিবাদ বাধল শল্যের। দুর্যোধন নানা অনুনয়-বিনয়ে উভয়কে শান্ত করলেন। এবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন কর্ণ।

কর্ণের সংগে প্রথমেই যুদ্ধ হল যুধিষ্ঠিরের। যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ণ বাণ এমন আঘাত হানল যে কর্ণ রথের উপর মূর্চ্ছা গেলেন। কিন্তু তিনি চৈতন্য লাভ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রবল বেগে আক্রমণ করলেন। যুধিষ্ঠিরের গোটা শরীর জ্বলতে লাগল কর্ণের বাণে। তিনি রণভূমি ত্যাগ করলেন। ভীম তখন ঠেকাতে লাগলেন কুরু সৈন্যদের।

অর্জুন ব্যস্ত ছিলেন ত্রিগর্তবাসী সৈন্যদের ধ্বংস করতে। তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে ছুটে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। শ্রান্ত যুধিষ্ঠির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "অর্জুন, তুমি বৃথাই প্রতিজ্ঞা করেছিলে কর্ণকে বধ করবে বলে। সে প্রতিজ্ঞা যখন রাখতে পারলে না তখন গাণ্ডীব অপরকে দাও।"

অর্জুনের আর এক প্রতিজ্ঞা ছিল—গাণ্ডীবত্যাগের কথা যিনি বলবেন তাঁকে তিনি হত্যা করবেন। তাই ক্রুদ্ধ পার্থ খড়্গ নিয়ে ছুটে এলেন ধর্মপুত্রকে বধ করতে। শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বাঁচালেন। কিছুক্ষণ পরে অর্জুন নিজের ভুল

বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন ; ক্ষমা চাইলেন জ্যেষ্ঠের কাছে। আর প্রতিজ্ঞা করলেন—"হয় আজ কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হবেন অথবা মাতা কুন্তী হারাবেন অর্জুনকে—এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হলে রণক্ষেত্র থেকে আর ফিরব না।" এই বলে অর্জুন প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রণক্ষেত্রে।

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

এদিকে ভীম ও দুঃশাসনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দুঃশাসন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর বাণে ভীমের ধনু ছিন্ন হল—সারথি হলেন নিহত। ভীমসেন তখন গদা নিয়ে দুঃশাসনকে আক্রমণ করলেন। সে আঘাত এমন মারাত্মক হল যে দুঃশাসন রথ থেকে ছিটকে পড়লেন অনেক দূরে। ভীম তখন কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি কুরু-বীরদের ডেকে বললেন—"কেউ পার দুঃশাসনকে রক্ষা কর।"

ভীম রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে দুঃশাসনের গলা চেপে ধরলেন পা দিয়ে। তারপর বলতে লাগলেন, "যেদিন আমরা রাজসভা থেকে বনবাসের জন্যে চলেছি, সেদিন তুমিই না আমাদের গরু গরু বলে উপহাস করেছিলে ; তুমিই না প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলে—আর চেয়েছিলে তাকে বস্ত্রহীনা করতে ! সেই পাপের আজ যোগ্য শাস্তি তোমাকে দিচ্ছি।"

এই বলে শাণিত অস্ত্র দিয়ে দুঃশাসনকে হত্যা করলেন—

আর বুক চিরে পান করলেন উষ্ণ রক্ত। ভীম সোল্লাসে বললেন, "জগতে অনেক মধুর পানীয় আছে তবে শত্রুর এই রক্ত তাদের সব থেকে মধুরতর।" ভীমের এই রক্তমাখা মুখ দেখে কুরুসৈন্য ভয়ে পালিয়ে গেল। তারা বলতে লাগল—"এ মানুষ নয়—এ মানুষ নয়।" ধৃতরাষ্ট্রের আরও দশটি পুত্র সেদিন প্রাণ হারালেন ভীমের হাতে।

কর্ণ বধ

এবার যুদ্ধে এগিয়ে এলেন কর্ণপুত্র বৃষসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধ করতে না করতে অর্জুনের এক অব্যর্থ শরে তিনি লুটিয়ে পড়লেন রণক্ষেত্রে। কর্ণ পুত্রশোকে অধীর হলেন; উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করলেন অর্জুনকে। ভূলোক-দ্যুলোক কেঁপে উঠল। দেবতা-দানব যে যেখানে ছিলেন, হয় পাণ্ডবদের নয় কৌরবদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে সমগ্র বনভূমি ভরে গেল মৃতদেহে, ছিন্ন বাহুতে আর ছিন্ন মুণ্ডে।

গাণ্ডীবীর ভীষণ মূর্তি দেখে মহাবীর অশ্বত্থামাও ভীত হলেন। তিনি দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন—"এখনও সময় আছে, যুদ্ধ বন্ধ করুন; রাজ্য ফিরিয়ে দিন পাণ্ডবদের। নতুবা সবই ধ্বংস হবে।"

দুর্যোধন খুবই চিন্তিত হলেন, বললেন, "এখন আর কোন উপায় নাই। দুঃশাসন চলে গেছে। ভীম আমাকেও ছাড়বে না। আর পার্থ ত ছাড়বে না কর্ণকে।"

কর্ণ ও অর্জুন তখন তাদের সেরা সেরা অস্ত্র ছাড়তে লাগলেন। কর্ণ এমন একটি বাণ ছাড়লেন যাতে লুকিয়ে ছিল তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেন। খাণ্ডব দাহনে তার মাতাকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন অর্জুন। তার প্রতিশোধ এখন সে নিতে এসেছে। কৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে রথের চাকা মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। কর্ণের বাণের আঘাতে অর্জুনের সোনার মুকুট পুড়ে গেল। আর কিছু ক্ষতি হলো না।

অর্জুনও তীক্ষ্ণ বাণ মেরে কর্ণের মুকুট এবং বর্ম খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। তাঁর বর্মহীন দেহ রক্তাক্ত হল। কর্ণের কাছে অনেক দিব্য-অস্ত্র ছিল। কিন্তু তিনি আজ গুরুর অভিশাপে কিছুতেই সেগুলি স্মরণে আনতে পারলেন না। তা ছাড়া এক ব্রাহ্মণের অভিশাপের জন্য তাঁর রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। রথ হল অচল।

কর্ণ নিজেকে খুবই বিপন্ন বোধ করলেন। অর্জুনকে বললেন, "আমার রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে গেছে—এ সময় শর নিক্ষেপ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। আমাকে সময় দাও। রথচক্র তুলে আবার যুদ্ধ করব।"

কৃষ্ণ হেসে বললেন, "আজ যে তুমি বড় ধর্মের কথা বলছ কর্ণ! কিন্তু যেদিন দুর্যোধনের সঙ্গে মিলে কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান করছিলে, যেদিন শকুনির কপট পাশায় পাণ্ডবদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলে অথবা যেদিন অন্যায় যুদ্ধে ছ' জন

মহারথী মিলে বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে—সেদিন কোথায় ছিল তোমার এই ধর্মজ্ঞান ?"
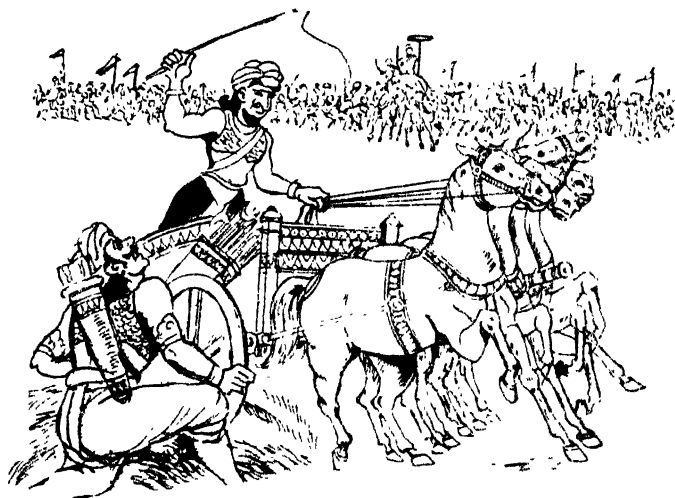
কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেছে

কর্ণ কি আর করবেন ? ভূমিতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন। তারপর অর্জুনের সহস্ররশ্মি বাণে কর্ণের মুণ্ড ধরাশায়ী হল।

সূর্য অস্ত গেল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিন হল অতিক্রান্ত।

শল্য পর্ব

শল্য বধ

ভীষ্ম গেছেন, দ্রোণ গেছেন, কর্ণও গেলেন। কৌরব শিবিরে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার। কাকে এবার সেনাপতি করা যায়? দুর্যোধন অনেক ভেবে স্থির করলেন অশ্বত্থামা সেনাপতি হবেন। কিন্তু অশ্বত্থামা নিজেই পরামর্শ দিলেন —কুল, বীর্য, তেজ সব দিক দিয়ে শল্য হলেন যোগ্য ব্যক্তি। দুর্যোধন তখন তাঁকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন।

অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কৌরব পক্ষ আজ এক নূতন কৌশল অবলম্বন করলেন। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শকুনি, দুর্যোধন, শল্য সকলেই একযোগে আক্রমণ করলেন পাণ্ডব সৈন্যদের। পাণ্ডবদের প্রচুর সৈন্য নিহত হল। যুধিষ্ঠির তখন সঙ্কল্প করলেন মাতুল শল্যকে তিনি আজ বধ করবেনই। তাঁর বাণে শল্যের রথ ও সারথি নষ্ট হল। অন্য-রথে চড়ে শল্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এবার ভীমও যোগ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাবীর শল্য নিহত হলেন যুধিষ্ঠিরের অগ্নিবাণে।

শল্যের মৃত্যুর পর দুর্যোধন নিজে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্র করতে লাগলেন। ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ভল্লের আঘাতে শাল্ব নিহত হলেন। ভীমও ভীষণ যুদ্ধ করলেন। তাঁর হাতে মরলেন দুর্যোধনের অবশিষ্ট

ভ্রাতারা। সহদেব হত্যা করলেন শকুনিকে। দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রায় শূন্য হয়ে গেল। যৎসামান্য যারা রইল তারা প্রাণ ভয়ে এদিকে ওদিকে পালাল। স্বয়ং রাজা দুর্যোধনও প্রবেশ করলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে।

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তখনও জীবিত। তাঁরা খুঁজতে লাগলেন রাজা দুর্যোধনকে। সঞ্জয়ের কাছে তাঁরা জানলেন তিনি রয়েছেন দ্বৈপায়ন হ্রদে। তখন দুর্যোধনের কাছে গিয়ে তাঁরা বললেন, "রাজা! আপনি চলুন, আবার যুদ্ধ করুন; জয়ী হয়ে পৃথিবী ভোগ করুন নতুবা সম্মুখযুদ্ধে বীরের বরণীয় মৃত্যু লাভ করুন।"

দুর্যোধন বললেন, "আজকের রাতটা আমায় বিশ্রাম করতে দিন, আমি বড় ক্লান্ত।"

দুর্যোধনের উরুভঙ্গ

পাণ্ডব শিবিরে খবর গেল দুর্যোধন লুকিয়ে আছেন দ্বৈপায়ন হ্রদে। শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "সুযোধন! সমস্ত ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে তুমি কেন এখানে পালিয়ে এলে? কোথায় গেল তোমার দর্প? কোথায় গেল তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম?"

যুধিষ্ঠিরের বিদ্রূপবাণে মর্মাহত হয়ে দুর্যোধন বললেন, "আমার সকল সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে,—কাজ নেই আমার

রাজ্যে। আমি বনবাসী হব। আপনারাই রাজ্য ভোগ করুন।”

যুধিষ্ঠির বললেন, “আজ এ কথা কেন বলছ সুযোধন? আমরা ত মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলাম, তখন তাও দাওনি। বলেছিলে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও তুমি দেবে না। কাজেই ওঠ, যুদ্ধ কর।” তাতেও দুর্যোধন যুদ্ধ করতে চান না; বললেন, “আমার অস্ত্র নেই, নেই বর্ম, কি করে আমি যুদ্ধ করব?”

যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে অস্ত্র ও বর্ম দিতে স্বীকৃত হলেন; আর বললেন যে কোন একজন পাণ্ডবের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন প্রস্তাব করলেন, “আমি গদাযুদ্ধ করব ভীমের সঙ্গে। অন্য সকলে হবেন দর্শক।”

ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বলরাম বললেন, “যুদ্ধ যদি করতে চাও এখানে কেন? পুণ্য ভূমি কুরুক্ষেত্রে সকলে চল। সেখানে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে স্বর্গলাভ হবে।”

বলরামের কথামত কুরুক্ষেত্রে তাঁরা চলে এলেন। গদা-যুদ্ধ আরম্ভ হল। দুই মত্তহস্তী যেন যুদ্ধ করতে করতে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কিছুতেই যুদ্ধ শেষ হয় না। এমন সময় অর্জুন নিজের বাম উরুতে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। ভীমের মনে পড়ে গেল নিজের প্রতিজ্ঞার

কথা। তিনি দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন বলে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ভীম অধিক বলশালী হলেও দুর্যোধন ছিলেন অধিক কৌশলী। দুর্যোধন একবার এমন আঘাত করলেন যে ভীম সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু একটু পরে যখন চেতনা ফিরে

ভীম প্রবল বিক্রমে দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন

এল, তখন তিনি প্রবল বিক্রমে দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। দুর্যোধন লাফিয়ে যেই উপরে উঠেছেন তখনই ভীম প্রচণ্ড গদাঘাতে তাঁর দুই উরু ভেঙ্গে ফেললেন। দুর্যোধন এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ভীম দুর্যোধনের মাথায় পদাঘাত

করতে করতে বললেন, "দ্রৌপদীকে যে অপমান করেছিলে এই তার ফল।"

যুধিষ্ঠির কিন্তু সজলচক্ষে এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন, "সুযোধন, দুঃখ কোরো না ভাই। তুমি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ করে স্বর্গে চললে; আমরা কিন্তু পড়ে রইলাম বন্ধুহীন, জ্ঞাতিহীন মহা-শ্মশানে।"

সৌপ্তিক পর্ব

পাণ্ডব শিবিরে হত্যাকাণ্ড

ভগ্ন উরু নিয়ে রক্তমাখা গায়ে রাজা দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পড়ে আছেন। অশ্বত্থামা এ খবর পেয়ে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। অশ্বত্থামা বললেন, "আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব—আপনি আমাকে সেনা-পতি পদে অভিষিক্ত করুন।" রাত্রির অন্ধকারে কৃপাচার্য কলসী ভরে জল আনলেন। সেইজল দিয়ে হল অশ্বত্থামার অভিষেক।

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দুর্যোধনের কাছে বিদায় নিয়ে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। রাত্রি গভীর হল। একটি গাছের নীচে তাঁরা শুয়ে রইলেন। ক্লান্ত কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু জেগে রইলেন অশ্বত্থামা। তিনি শুধু ভাবছেন কি করে তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দেখলেন তাঁর অভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়ার উপায়। অদূরে একটি বিরাট বটগাছ, অনেকগুলি পাখী বাস করছে সেখানে। একটা কালো পেঁচা এসে ধারাল নখ দিয়ে তাদের শিশুদের আক্রমণ করল। পাখীগুলি সব ঘুমিয়েছিল; জেগে উঠে দেখল শাবকদের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে গাছের নীচে। তখন তাদের শোকার্ত চিৎকারে

আকাশ কেঁপে উঠল। নিদ্রিত কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যও জেগে উঠলেন।

অশ্বত্থামা খুঁজে পেয়েছেন তার অভীষ্ট পূরণের পথ। তিনি রাত্রির অন্ধকারে ঠিক এই পেঁচার মত প্রবেশ করবেন নিদ্রিত পাণ্ডবদের শিবিরে; ধ্বংস করবেন পাণ্ডবপক্ষের বীরদের। কৃপাচার্য প্রথমে রাজী হননি। অনেক হিতকথায় অশ্বত্থামাকে তিনি বোঝাতে চাইলেন, এ বড় অধর্মের কাজ। কিন্তু অশ্বত্থামার অনুরোধে তিনি শেষে রাজী হলেন। তিন জনে চললেন পাণ্ডবশিবিরের দিকে।

পাণ্ডবশিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহাকায় পুরুষ। অশ্বত্থামা বুঝলেন স্বয়ং মহাদেব দ্বার রক্ষা করছেন। তবে উপায়? অশ্বত্থামা শিবের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শেষে মহাদেব বললেন—“পাণ্ডবদের বিনাশকাল উপস্থিত হয়েছে। এখন আমিও তাদের রক্ষা করতে পারব না।” এই বলে মহাদেব দ্বার ছেড়ে দিলেন এবং একটি খড়্গও দিলেন অশ্বত্থামাকে।

পাণ্ডব শিবিরে ঢুকেই অশ্বত্থামা খড়্গ দিয়ে হত্যা করলেন নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে। তারপর পঞ্চপাণ্ডব ভেবে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে অশ্বত্থামা হত্যা করলেন। আরও অনেক বীর নিহত হন অশ্বত্থামার খড়্গে। পাণ্ডবদের সুখের নীড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

দুর্যোধনের মৃত্যু

এদিকে দুর্যোধন মাটির উপর প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। চারদিকে ঘিরে রয়েছে কুকুর ও শৃগাল। তারা তাঁর মাংস খাবার জন্য চেষ্টা করছে—আর তিনি অতি-কষ্টে হাত দিয়ে তা নিবারণ করছেন। এমন সময় অশ্বত্থামা ছুটে এসে বলতে লাগলেন—"রাজা, আপনি কি বেঁচে আছেন? যদি বেঁচে থাকেন তবে শুনুন—পাণ্ডবপক্ষে মাত্র সাতজন বেঁচে আছে; আর সবকে হত্যা করে এসেছি।" মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের মুখে একটুখানি যেন হাসি ফুটে উঠল। তিনি অশ্বত্থামাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ যা করতে পারেননি আপনি তা করেছেন। আপনার মঙ্গল হোক। আমি চললাম—স্বর্গে আবার দেখা হবে।" এই বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পাণ্ডবদের শোক

পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি রাত্রে শিবিরের বাইরে শয়ন করেছিলেন। ভোর হতে না হতে যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন গত রাত্রের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা। পাণ্ডবশিবিরে বিষাদের ঘনছায়া নামল। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ক্ষত্রিয় রমণীর মত তিনি বললেন, "যে অশ্বত্থামা আমার এই সর্বনাশ করেছে তার মাথার মণি আমাকে এনে দিতে হবে। নতুবা আমার এই শোকের সান্ত্বনা হবে না।"

অশ্বত্থামার মাথায় একটি সহজাত উজ্জ্বল মণি ছিল। ভীম তখনিই অশ্বত্থামার খোঁজে রওনা হলেন নকুলকে সঙ্গে নিয়ে। কৃষ্ণও তাঁর রথে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনকে নিয়ে ভীমের অনুসরণ করলেন।

তাঁরা কিছুদূর গিয়ে দেখেন গঙ্গাতীরে অশ্বত্থামা ঋষিদের মধ্যে ঋষি সেজে বসে আছেন। গায়ে ছাই মাখা। ভীম তাঁকে তাড়া করলেন ধনুর্বাণ নিয়ে। অশ্বত্থামা দেখলেন আর উপায় নেই। তিনি তখুনি প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মশির অস্ত্র। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এই অস্ত্র দিয়েছিলেন মাত্র দুজনকে—প্রিয় শিষ্য অর্জুন ও নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে। কৃষ্ণের অনুরোধে পাণ্ডবদের রক্ষার জন্য অর্জুনও তখন ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়লেন। ভীষণ অস্ত্র এই ব্রহ্মশির। উভয় অস্ত্রের পরস্পরকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে অগ্নির সৃষ্টি হল, তাতে এই পৃথিবী ধ্বংস হয় হয়। ছুটে এলেন স্বয়ং ব্যাসদেব ও নারদমুনি। তাঁরা বললেন, "সৃষ্টি যে ধ্বংস হতে চলল; তোমরা যে যার অস্ত্র ফিরিয়ে নাও।" অর্জুন এই অস্ত্র ফিরাতে পারতেন—কিন্তু অশ্বত্থামার ক্ষমতা ছিল না ব্রহ্মশির অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়ার। তাই ঠিক হল অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে নাশ করবে—আর অর্জুনের অস্ত্র নিয়ে আসবে অশ্বত্থামার মাথার মণি।

উত্তরার গর্ভে তখন পাণ্ডবকুলের আশা ভরসা পরীক্ষিত। এই সন্তান যদি নষ্ট হয় তবে কুরুপাণ্ডব উভয়কুলের কেউ

থাকবে না—এই ভাবনায় সকলে অস্থির। তখন শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিয়ে বললেন—"সেজন্য কোন ভাবনা নেই। ঐ সন্তানকে আমি রক্ষা করব।" উত্তরার সেই সন্তানই হলেন পরবর্তী কালের রাজা পরীক্ষিত।

অশ্বত্থামাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মাথার মণি দিতে হল। একান্ত অপমানিত হয়ে অশ্বত্থামা মনের দুঃখে বনে চলে গেলেন। আর ভীম অশ্বত্থামার মাথার মণি এনে দিলেন দ্রৌপদীকে। তা পেয়ে দ্রৌপদী কিছুটা শান্ত হলেন।

স্ত্রী পর্ব

শোক ও সৎকার

কুরুক্ষেত্র আজ মহাশ্মশান। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছেন রথী মহারথীরা। অন্ধরাজা যুদ্ধক্ষেত্রের সকল খবরই সঞ্জয়ের কাছে জানতে পেরেছেন। কিন্তু শেষে যখন শুনলেন ভীমসেন দুর্যোধনকে হত্যা করেছেন তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। শোকার্ত রাজাকে সঞ্জয় অনেক বুঝিয়ে বললেন, "দুঃখ করে কি হবে মহারাজ! লোভের বশবর্তী হয়ে আপনি যুদ্ধের আগুন জ্বেলেছিলেন—সেই আগুনে আপনার পুত্রেরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছে। নিজেই নিজেকে এখন শান্ত করুন।" ব্যাসদেবও অনেক সান্ত্বনা দিলেন। এদিকে অন্তঃপুরে উঠেছে গভীর কান্নার রোল। গান্ধারী ও শতপুত্রের বিধবা বধূরা সকলেই শোকে কাতর। তাঁদের সকলকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র চললেন কুরুক্ষেত্রে, পুত্রদের সৎকারের জন্য। কুন্তীদেবীও এলেন এঁদের সঙ্গে। হস্তিনাপুরের অধিবাসী যাঁরা তখনও বেঁচেছিলেন—তাঁরাও অনুসরণ করলেন বৃদ্ধ রাজাকে।

কুরুক্ষেত্রের পথে এসে যোগ দিলেন দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ। কাঁদতে কাঁদতে এলেন পাঞ্চাল রমণীরা। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁকে

আশীর্ব্বাদ এবং আলিঙ্গন করে বললেন, "ভীমকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও। আমি তাকে আলিঙ্গন করব।" কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন বৃদ্ধ রাজার অন্য কোন অভিপ্রায় আছে। তাই তিনি এগিয়ে দিলেন লোহা দিয়ে তৈরী এক মূর্তি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহ-ভীমকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বৃদ্ধ রাজা মনে মনে ভীমের প্রতি খুবই রুষ্ট ছিলেন; ভাবলেন পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে এল অনুশোচনা। কি করলেন তিনি! ভীম ত তাঁর পুত্রতুল্য। ধৃতরাষ্ট্র কাঁদতে লাগলেন! শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসে জানালেন যে লোহার তৈরী ভীমকে তিনি ধ্বংস করেছেন; তাতে ভীমের কিছুই হয়নি। বৃদ্ধ রাজা আশ্বস্ত হলেন এবং পুত্রস্নেহে আলিঙ্গন করলেন অন্যান্য পাণ্ডবদের।

কিন্তু পুত্রশোকে পাগলিনী গান্ধারী তখনও পাণ্ডবদের প্রতি খুবই কুপিতা। তাঁর শতপুত্রের একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। তিনি এজন্য যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ দিতে গেলেন। এমন সময় ব্যাসদেব তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, "মা গান্ধারী, তুমি ত দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করেছিলে 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'। যেখানে ধর্ম সেখানে জয় হবেই। পাণ্ডবদের পক্ষে ধর্ম ছিল; তাই পাণ্ডবেরা বিজয়ী হয়েছে। এখন তাদের তুমি আশীর্বাদ কর।"

গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু ক্ষমাহীন কণ্ঠে

ভীমের নিন্দা করতে লাগলেন। ভীম অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে দুর্যোধনকে ; বুক চিরে রক্ত পান করেছে দুঃশাসনের।

ভীম এগিয়ে এসে বললেন গান্ধারীকে, "অনেক অন্যায়, অনেক অপমান আমরা সয়েছি। দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের ব্যবহারের কথাও তুমি মনে কর, মা!"

গান্ধারী তখন বললেন—"দুর্যোধন ও দুঃশাসনকেই না হয় তোমরা হত্যা করলে ; তারা অনেক অপরাধ করেছিল। কিন্তু আমার একশত পুত্রের একজনকেও তোমরা জীবিত রাখতে পারলে না ?"

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন পাণ্ডবেরা! যুধিষ্ঠির করজোড়ে শুধু বললেন, "আমিই তোমার পুত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমাকে অভিশাপ দাও, মা। এখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার শ্রেয়।" এতে পাণ্ডবদের উপর গান্ধারীর রাগ খানিকটা কমল কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন— "আজ যেমন আমার বংশে কেউ থাকল না তেমনি ছত্রিশ বছর পরে তোমারও যদুবংশে কেউ থাকবে না।" স্বামী জন্মান্ধ বলে পতিপ্রাণা গান্ধারী এতদিন দুটি চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। বিবাহের পর এই প্রথম তিনি সে বাঁধন খুললেন ; দেখলেন শতপুত্রের শবদেহ।

কিন্তু মৃতদেহগুলির সংকার করা প্রয়োজন। শত শত চিতা জ্বলে উঠল কুরুক্ষেত্রের বিরাট শ্মশানে। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে পাণ্ডবেরা সকলে এলেন গঙ্গাতীরে।

কৌরব রমণীদের সঙ্গে পাণ্ডবেরা যথাবিধি তর্পণ করতে লাগলেন।

এমন সময় কুন্তীদেবী সজল নয়নে বলে উঠলেন—"যুধিষ্ঠির! কর্ণের উদ্দেশ্যেও তোমরা তর্পণ কর। সে তোমাদের সকলের আগে আমার গর্ভে এসেছিল। সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।" যুধিষ্ঠির কাতরকণ্ঠে বললেন—"কেন মা, তুমি আগে একথা বলনি? একথা জানলে ত এই সর্বনাশা ভ্রাতৃবধ বন্ধ হত!" কর্ণের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠির কর্ণের জন্য তর্পণ করলেন।

তর্পণের পর যুধিষ্ঠির সকল ভাইকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস করলেন একমাস।

শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব

ভীষ্মের উপদেশ

যুদ্ধে জয়ী হলেন পাণ্ডবেরা। কিন্তু কারুর মনে শান্তি নেই ; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের। তিনি কিছুতেই সিংহাসনে বসতে চাইলেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী অনেক বোঝালেন। বোঝালেন ধৃতরাষ্ট্রও। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন রাজধর্ম পালনে সায় দিল না।

তারপর এলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। তিনি বললেন, "যুধিষ্ঠির ! তুমি ক্ষত্রিয় রাজা। হস্তিনায় ফিরে গিয়ে রাজার কর্তব্য পালন কর। আর তাতেই রয়েছে তোমার ধর্ম।"

যুধিষ্ঠির এর পরেও পরামর্শের জন্য গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তিনিও তাঁকে হস্তিনায় গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন ; আর বললেন, "পিতামহ ভীষ্ম বেশীদিন বাঁচবেন না। মনকে যদি শান্ত করতে চান তবে তাঁর কাছে উপদেশ নিন।" ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলেছিলেন।

যুধিষ্ঠির আর কি করেন ! নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খের পবিত্র জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। যথাবিধি রাজ্যভার গ্রহণ করলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু তার পূর্বে তিনি সমবেত প্রজাদের কাছে ঘোষণা করলেন—"জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রই হলেন আমার ও আপনাদের সকলের অধিপতি।

আপনারা যদি সত্যিই আমার মঙ্গল চান তবে এই কথা সর্বদা মনে রাখবেন।”

এদিকে ভীষ্ম শরসজ্জায় শায়িত। দক্ষিণায়নের শেষে উত্তরায়ণের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ এলেন পঞ্চপাণ্ডবকে সঙ্গে করে। পরম ভক্তিভরে তাঁরা পিতামহের চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতামহকে বললেন—“পিতামহ! জ্ঞাতি-শোকে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল। ধর্ম, অর্থ, সমাধি ইত্যাদি বিষয়ে আপনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে তাঁর মনকে শোকমুক্ত করুন।” কিন্তু ভীষ্মদেব তখন এতই দুর্বল যে তিনি ভাল করে কথা বলতে পারছেন না। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বর দিলেন, “এখন থেকে আপনার দেহের ও মনের কোন অবসাদ থাকবে না। ইন্দ্রিয়গুলি হবে সতেজ। যে বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন সে বিষয়েই আপনার বুদ্ধি প্রখর হবে। আপনি দিব্যচক্ষু লাভ করে ইহলোক ও পরলোকের সবকিছু দেখতে পাবেন।”

তারপর কয়েকদিন ধরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিলেন। রাজধর্ম কি? সত্যাসত্য কি, পাপপুণ্যই বা কি? মানুষের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়—এক-একটি প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠির আর জ্ঞানগর্ভ ও সুললিত ভাষায় তার উত্তর দেন পিতামহ ভীষ্ম।

রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্মের উপদেশগুলি মহাভারতের অমূল্যরত্ন।

রাজধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বললেন—"যুধিষ্ঠির! তুমি সর্বদাই পুরুষকার অবলম্বন করবে। দৈব ও পুরুষকার

শরশয্যা থেকে পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিলেন

দুটিই কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন; কিন্তু আমি পুরুষকারকে উভয়ের মধ্যে বড় বলে মনে করি। কার্যসিদ্ধির জন্য শুধু দৈবকে যারা অবলম্বন করতে চায় তারা ভুল করে। তুমি সকল কাজে সরলতা অবলম্বন করবে—কিন্তু শাসন ব্যাপারে নিজের মন্ত্রণা ও নিজের কৌশল সব সময় গোপন রাখবে। রাজার সর্বদা কোমল স্বভাব হওয়া উচিত নয়। মৃদুভাবাপন্ন রাজাকে কেউ মান্য করে না। আবার সর্বদা তীক্ষ্ণ (কঠোর) স্বভাব রাজা সকলের উদ্বেগের কারণ। কাজেই ক্ষেত্র অনুসারে

রাজা কখনও কোমল এবং কখনও বা কঠোর স্বভাব হবেন। কাউকে তিনি অতি বিশ্বাস করবেন না; অত্যন্ত অবিশ্বাসও করবেন না কাউকে।"

শত্রু আক্রমণ করলে কি করতে হবে ভীষ্ম তাও বললেন যুধিষ্ঠিরকে, "প্রবল শত্রু যদি আক্রমণ করে তবে রাজা আশ্রয় নেবেন দুর্গের মধ্যে। বিপদের দিনের জন্য সাধ্যমত শস্য রাজাকে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যেসব শস্যক্ষেত্র শত্রুর হাতে যাওয়ার ভয় আছে তা পুড়িয়ে দেবেন। যেপথ দিয়ে শত্রু আসবে সেই পথের সমস্ত জলাশয়ে বিষ মিশিয়ে রাখবেন। নদীর সেতু দেবেন ভেঙ্গে।"

আপদ্ধর্ম সম্বন্ধে পিতামহ বললেন—"বিপন্ন রাজা সন্ধি প্রভৃতি দ্বারা নিজের গ্রাম ও নগরাদি রক্ষা করবেন। নিজেকে রক্ষার জন্য আপদ কালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করবেন। কদাচ দীর্ঘসূত্রী হবেন না। সর্বদা আলস্য পরিত্যাগ করবেন।"

যুধিষ্ঠির তারপর জানতে চাইলেন মোক্ষধর্মের কথা। পিতামহ তার উত্তরে অনেক কথা বললেন; বললেন—"তপস্যার দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মালে ইহলোকেই মানুষ মোক্ষলাভ করে। মানুষের জীবন অনিত্য; কখন যে মৃত্যু আসে তার ঠিক নেই। তাই অল্পবয়সেই ধর্মানুশীলন করা উচিত। সর্বদা সত্যবাদী হতে হবে; সত্য দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।"

এই সব কথায় যুধিষ্ঠিরের মন অনেকখানি শান্ত হল। তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভ হল উত্তরায়ণ। দেবব্রত ভীষ্ম এবার দেহত্যাগ করবেন। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন দিন তিনি শরশয্যায় শুয়েছিলেন। ভীষ্মের শেষদিন উপস্থিত শুনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির ছুটে এলেন ভীষ্মের কাছে। চোখ তুলে ভীষ্ম চাইলেন অন্ধ রাজার দিকে এবং বললেন, "ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শোক কোরো না। পাণ্ডবেরাই এখন তোমার পুত্র। তাদের তুমি ধর্মানুসারে পালন কোরো।" ইতিমধ্যে কৃষ্ণও এসেছেন ভীষ্মের শয্যাপার্শ্বে। কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "আমি সব সময় বলেছি যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম; যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।† আমি জানি অর্জুন ও তুমি নর-নারায়ণ রূপে এই পৃথিবীতে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলে।"

তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সত্যবিষয়ে তোমরা সবাই যত্নবান হয়ো। সত্যই পরম বল।"* যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, "যাঁরা ব্রাহ্মণ, প্রাজ্ঞ, আচার্য, ঋত্বিক—তাঁরা সবাই তোমার পূজনীয়।"

---

† যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্মো, যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ ॥

* সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্ ॥

এরপর ভীষ্ম আর কোন কথা বললেন না। মন স্থির করলেন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে। তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল দেহ থেকে। স্বর্গ থেকে অষ্টবসুর এক বসু ভীষ্মরূপে এসে-ছিলেন এই ধরায়; তাঁর কাজ শেষ করে তিনি চলে গেলেন নিজের স্বর্গধামে। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

অশ্বমেধ পর্ব

পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ

পিতামহ ভীষ্ম গত হলেন। যুধিষ্ঠির আবার ভাসলেন শোকসাগরে। জ্ঞাতিবধের অনুতাপ তাঁকে অহরহ ব্যথিত করে তুলল। ব্যাসদেব একদিন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "জ্ঞাতি-ভাইদের হত্যায় যদি পাপ হয়েছে বলে ভাব, তবে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। প্রাচীন কালে রাজারা পাপ দূর করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন।"

অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য একটি তেজস্বী অশ্বকে ছেড়ে দিতে হয়। তাকে রক্ষার জন্য অবশ্যই অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকবে। অশ্বটি এক বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরবে। যদি কোন রাজা সে অশ্বকে আটক করে না রাখতে পারে এবং নিরাপদে তা ফিরে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে, রাজারা বশ্যতা স্বীকার করেছেন। তখন ঐ অশ্বের মাংস দিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন হবে।

স্বয়ং অর্জুন গেলেন অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে। ত্রিগর্তবাসী রাজার পুত্র ও পৌত্রগণ অশ্ব ধরার জন্য এলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁরা অর্জুনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তারপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তের পুত্র সোমদত্ত অশ্বকে হরণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু যুদ্ধে সোমদত্ত পরাজিত হলেন। পার্থ দয়া করে অবশ্য তাঁকে প্রাণে মারলেন না। তারপর এলেন জয়দ্রথের রাজ্যে—সিন্ধুদেশে। অর্জুনের নাম শুনেই জয়দ্রথের

পুত্র সুরথ প্রাণত্যাগ করেন। দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলা এসে অর্জুনের কাছে তাঁর পৌত্রের প্রাণ ভিক্ষা করলেন। অর্জুন তাঁকে অভয় দিয়ে চলে গেলেন মণিপুর রাজ্যে।

মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে পার্থ পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। পার্থ ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন তখন মণিপুরের রাজা। তিনি প্রথমে পিতা অর্জুনকে বাধা দিলেন না বরং জানালেন সাদর অভ্যর্থনা। কিন্তু অর্জুন পুত্রের এ ব্যবহার ক্ষত্রিয়োচিত নয় বলে তিরস্কার করলেন। তখন পিতা-পুত্রে ভীষণ যুদ্ধ হল এবং অর্জুন বভ্রুবাহনের শরে প্রাণত্যাগ করলেন। বভ্রুবাহন তা দেখে শোকে মূর্ছা গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি—ভীষ্মদেব ছিলেন অষ্টবসুর একজন। তাই অর্জুন যখন শিখণ্ডীর সাহায্যে অন্যায়ভাবে পিতামহ ভীষ্মকে পরাজিত করলেন তখন বসুরা ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা অভিশাপ দিলেন নিজপুত্রের কাছে অর্জুনও এই রকম অপমানিত হবেন। বীর শ্রেষ্ঠ পার্থকে নিজের ছেলের কাছেই পরাজিত হতে হবে। সেই অভিশাপ আজ সফল হল।

পিতা-পুত্র উভয়েই পড়ে রইলেন রণক্ষেত্রে। চিত্রাঙ্গদা ছুটে এলেন; স্বামী ও পুত্রের এই অবস্থা দেখে খুবই বিলাপ করতে লাগলেন। এই বিপদে সহায় হলেন অর্জুনের অপর স্ত্রী নাগরাজকন্যা উলূপী। তিনি পাতাল থেকে সঞ্জীবন-মণি এনে অর্জুনকে বাঁচিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে বভ্রুবাহনও সংজ্ঞালাভ করেছেন। পুত্রের বীরত্বে অর্জুন খুবই সন্তুষ্ট

হলেন এবং তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দেবার জন্য বলে এলেন।

বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল, চেদি, মগধ প্রভৃতি সমস্ত দেশ জয় করে অর্জুন সব রাজাদের আমন্ত্রণ করে ফিরে এলেন। যজ্ঞের অশ্বও নির্বিঘ্নে ফিরে এল হস্তিনানগরে। দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণও যথাসময়ে এসে গেলেন। মহা ধুমধামে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

আশ্রমবাসিক পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পনের বছর অতীত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সকলে সুখে আছে। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডবদের পুরীতে বাস করছেন পরম শান্তিতে। জ্যেষ্ঠতাতের সম্মতি নিয়ে সকল কাজ করেন রাজা যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি বধূগণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করেন পরম যত্নে।

কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ভীম; দুর্যোধনের শত্রুতার কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর কথায় কখনও কখনও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অসম্মানের ভাব প্রকাশ পেত। ভীমের

এই ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর আর রাজপুরীতে থাকবার ইচ্ছা রইল না।

ধৃতরাষ্ট্র একদিন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "গান্ধারী এবং আমি আজ পনের বছর তোমাদের সেবায় পরম সুখে এই পুরীতে দিন কাটিয়েছি। এখন তোমরা অনুমতি দাও, তপস্যায় যাই।"

যুধিষ্ঠির খুব আপত্তি করলেন এই প্রস্তাবে। তিনি এমনও বললেন, "আপনি রাজপুরীতে থাকুন আমি বরং বনে যাই। কেননা আমিই দুর্যোধনের মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব যখন অনুমোদন করলেন তখন যুধিষ্ঠির অগত্যা রাজী হলেন।

কার্তিকী পূর্ণিমায় ধৃতরাষ্ট্র বনে যাত্রা করলেন। আগে আগে চলেছেন কুন্তী। পাণ্ডবেরা অবাক হয়ে জননী কুন্তীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "রাজা অন্ধ; গান্ধারীর চোখে কাপড় বাঁধা। কে এঁদের বনের পথে হাত ধরে নিয়ে যাবে! কেই বা করবে পরিচর্যা! আমাকে এঁদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমরা ধর্মে স্থির থেকে রাজ্য চালনা কর। মন তোমাদের মহৎ হোক।" বিদুর ও সঞ্জয় গেলেন এঁদের সঙ্গে।

গঙ্গার তীর ধরে চলতে লাগলেন ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যরা। পরে তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করলেন এক আশ্রমে। অল্পাহারে, অনাহারে থেকে তাঁরা কঠোর তপস্যা করেন। রাত্রি কাটে তৃণ-শয্যায়। বিদুর এই আশ্রমে রইলেন না। তিনি আরও

গভীর বনে প্রবেশ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে নগ্ন দেহে ও অনাহারে তপস্বী বিদুর ভগবদ্ আরাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। তারপর একদিন এই পঞ্চভূতের দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন স্বধামে। পরে সকলে জানলেন, স্বয়ং ধর্ম দেহধারণ করে বিদুররূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

মাঝখানে যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে বনবাসী ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং মাতা কুন্তীর কাছে এসেছিলেন। একমাস ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁরা শেষে ফিরে গেলেন হস্তিনায়।

কিছুদিন পরে এক নিদারুণ সংবাদ এল রাজধানীতে। বনযাত্রার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র এক যজ্ঞ করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই যজ্ঞাগ্নি বনের মধ্যে ফেলে চলে যান। এই অগ্নি একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তপস্যায় দুর্বলদেহ অন্ধরাজা, গান্ধারী ও কুন্তী ভগবানে মন স্থির করে বসে রইলেন শান্তভাবে। অগ্নি তাঁদের গ্রাস করলেন।

যুধিষ্ঠির এই সংবাদ পেয়ে খুবই বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর অন্য ভাইদের, পুরনারী ও প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে এক বস্ত্রে নগ্নপদে গেলেন গঙ্গাতীরে। গঙ্গার পবিত্র জলে সকলে মিলে তর্পণ করলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর মাতা কুন্তীর উদ্দেশ্যে।

মুষল পর্ব

যদুবংশ ধ্বংস

সতী নারী গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে ছত্রিশ বছর পরে তাঁর যদুবংশ ধ্বংস হবে। গান্ধারীর সে অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়। যদুবংশীয় বীরগণ অহংকারী হয়ে উঠলেন। তাঁরা সুরাপানে আসক্ত হলেন এবং নানারূপ অন্যায় কাজ করতে লাগলেন।

একদিন বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদমুনি এসেছেন দ্বারকায়। যাদবগণ কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে মুনিদের কাছে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বলুন ত ইনি কী সন্তান প্রসব করবেন ?" মুনিরা এই প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হলেন। বিরক্ত হয়ে তাঁরা বললেন, "ইনি মুষল প্রসব করবেন—আর সেই মুষলই তোমাদের সবংশে নিধন করবে।" পরদিনই শাম্ব প্রসব করলেন এক বিরাট মুষল।

কৃষ্ণের কাছে এ খবর গেল। তিনি যদুকুলের বিনাশ আসন্ন দেখে যাদব বীরদের দ্বারকা ছেড়ে প্রভাস তীর্থে যেতে বললেন। সেখানে ঝগড়া বাধল কৃতবর্মা আর সাত্যকির মধ্যে। উভয়ের বিবাদ ভীষণ আকার ধারণ করল এবং যদুকুলের সকলের মধ্যে ক্রমে তা পড়ল ছড়িয়ে। আরম্ভ হয়ে গেল পরস্পরে হানাহানি।

শাম্ব যে মুষলটি প্রসব করেছিলেন তাকে চূর্ণ করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল

সমুদ্রতীরে যত নল-খাগড়া ছিল তার সবই পরিণত হল মুষলে। আর তাই দিয়ে মারামারি করে যদুবংশের অনেক বীর নিহত হলেন।

কৃষ্ণ এই সংবাদ পেয়ে অর্জুনের নিকট দূত পাঠালেন— অর্জুন যেন সত্বর আসেন দ্বারকায়। যদুবংশের বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের রক্ষার জন্য আজ তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষ্ণ-বলরামের তিরোধান

শ্রীকৃষ্ণ নিজে চললেন দাদা বলরামের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে পাওয়া গেল এক বনের মধ্যে। বলরাম তখন ধ্যান-মগ্ন। কিছুক্ষণের মধ্যে সহস্র-ফণা একটি সাপ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এবং প্রবেশ করল সমুদ্রে। বলরামের প্রাণহীন দেহ ঢলে পড়ল বনভূমিতে।

বলরামের দেহত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের মন বিষাদে ভরে গেল। তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে বনের মধ্যে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর এক সময়ে যোগস্থ হয়ে শয়ন করলেন বনভূমিতে। লাল টুকটুকে পা দুটিকে মৃগ মনে করে জরা নামে এক ব্যাধ শর নিক্ষেপ করল। সেই শরে বিদ্ধ হল শ্রীকৃষ্ণের পদতল— শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হল এই ভাবে।

এদিকে পার্থ এসে হাজির হলেন দ্বারকায়। শুনলেন কৃষ্ণ-বলরামের অন্ত্যলীলার কথা। বিষাদে আকুল হয়ে উঠল তাঁর মন। তিনি যদুবংশের বালক, বৃদ্ধ ও নারীদের হস্তিনায়

নিয়ে চললেন। পথে তাদের আক্রমণ করল 'আভী'-দস্যুরা। অর্জুনের হাতে ছিল গাণ্ডীব কিন্তু তিনি তাতে জ্যা রোপণ

ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণের পদতল বিদ্ধ হল।

করতে পারলেন না। কোন দিব্যাস্ত্রের কথাও তখন তাঁর স্মরণে এল না। গাণ্ডীবীর সামনেই দস্যুরা যাদব-নারীদের হরণ করে নিয়ে গেল। অর্জুন বিষন্ন মনে ফিরে গেলেন হস্তিনায়। ব্যাসদেবকে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "অর্জুন! পৃথিবীর ভার হরণ করে কৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেছেন। তোমরাও যে জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তোমাদের কালও হয়েছে পূর্ণ।"

মহাপ্রস্থান পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী

অর্জুনের কাছে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের উপদেশ শুনলেন—তিনিও একথা ভাবছিলেন অনেকদিন থেকে। এবার সকলে মিলে স্থির করলেন রাজ্য ছেড়ে মহাপ্রস্থানে যাওয়াই শ্রেয়।

অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দেওয়া হল। দুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই যুযুৎসু রইলেন তাঁকে সাহায্য করতে। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হলেন। তারপর যুধিষ্ঠির ভাইদের ও দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। রাজভূষণ ছেড়ে তাঁরা পরলেন বল্কল। প্রজারা সকলে কাঁদতে লাগলেন; অনেক দূর পর্যন্ত তাঁদের পেছনে পেছনে এলেন। কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথে কাউকে বাধা দিতে নাই; তাই সজল চোখে তাঁরা ফিরে গেলেন। কিন্তু ফিরল না একটি কুকুর। সেটি পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

প্রথমে তাঁরা চললেন পূর্বদিকে। উপস্থিত হলেন লোহিত সাগরের তীরে। অর্জুনের হাতে রয়েছে গাণ্ডীব। পথে অগ্নিদেব এসে তাঁকে বললেন, "এ গাণ্ডীবের আর প্রয়োজন নেই অর্জুন! বরুণদেবকে এ ধনু তুমি ফিরিয়ে দাও।" তিনি সমুদ্রের জলে গাণ্ডীব বিসর্জন দিলেন।

ধীরে ধীরে পদব্রজে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন হিমালয়ে।

হিমালয়ের বন্ধুর পথে তাঁরা চলেছেন। বহুদূর অতিক্রম করার পর অতি দুর্গম প্রদেশে তাঁরা উপস্থিত। এমন সময় দ্রৌপদী সহসা মাটিতে পড়ে গেলেন; আর উঠলেন না। দ্রৌপদীর পতনের কারণ ভীম জিজ্ঞাসা করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির বললেন, "অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল বলে তাঁর পতন হল।" দ্রৌপদীর জন্য পাণ্ডবেরা সকলেই দুঃখ করতে লাগলেন। কিন্তু পেছন দিকে তাকাবার উপায় নেই কারুর। শ্রীভগবানের নাম করতে করতে তাঁরা এগিয়ে চললেন সামনে। আর কিছুদূর যাওয়ার পর সহদেবের পতন হল। যুধিষ্ঠির ভীমকে এর কারণ বললেন—"সহদেব মনে করত তার মত বুদ্ধিমান কেউ নেই।"

তারপর পড়লেন নকুল। "নকুল নিজেকে মনে করত সব থেকে সুন্দর, এই দোষে তার পতন হল"—যুধিষ্ঠির বললেন ভীমকে।

হিমালয়ের দুর্গম থেকে দুর্গমতর প্রদেশে তাঁরা চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ অর্জুনের পতন হল। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একাই তিনি সকল শত্রু ধ্বংস করবেন। কিন্তু সে কথা তিনি রাখতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন এই দোষে তাঁর পতন হয়েছে।

এবার পালা ভীমের। কিছুদূর অতিক্রম করার পর ভীম চিৎকার করে বললেন—"দেখুন, দেখুন মহারাজ আমারও পতন হল। বলুন কি আমার অপরাধ?" যুধিষ্ঠির বললেন,

"তোমার অপরাধ হল তুমি অপরের বল না জেনে নিজের বলের দম্ভ করতে। এছাড়া তোমার ছিল অতিভোজনের দোষ।"

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

যুধিষ্ঠির এবারও পেছন দিকে তাকালেন না। বিলাপের অবসর নেই মহাপ্রস্থানের পথে। অবসর নেই শোকেরও। শুধু এগিয়ে যাওয়া। যুধিষ্ঠির এগিয়ে চলেছেন সামনে; হিমালয়ের এক শিখর থেকে অন্য শিখরে। সঙ্গে রয়েছে সেই কুকুরটি। এমন সময় স্বর্গ থেকে ইন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন তাঁর রথ নিয়ে। ইন্দ্র বললেন, "যুধিষ্ঠির! তুমি রথে ওঠ; তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাব।"

যুধিষ্ঠির বললেন—"দ্রৌপদী এবং আমার চার ভাই পথে পড়ে রয়েছে। তাদের ফেলে আমি একা স্বর্গে যাই কি করে?" ইন্দ্র বললেন—"তারা দেহত্যাগ করে আগেই স্বর্গে গেছে। তুমি এখন চল সশরীরে। স্বর্গে তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।" "কিন্তু এই কুকুরটিও যাবে আমার সাথে আমাদের যাত্রার আরম্ভ থেকে সে রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে"—বললেন যুধিষ্ঠির। ইন্দ্র বললেন, "তা ত হয় না, রাজা! অশেষ পুণ্যের বলে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছ। কিন্তু এই কুকুরের কি পুণ্য আছে যে সে স্বর্গে যাবে?" যুধিষ্ঠির তখন বললেন—"কুকুরটি আমার আশ্রিত। আশ্রিতকে

ত্যাগ করব না আমি, তাতে আমার অধর্ম হবে তার চেয়ে বরং স্বর্গে আমি যেতে চাই না।"

যুধিষ্ঠির বললেন—"এই কুকুরটিও যাবে আমার সাথে

যুধিষ্ঠির এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি স্বমূর্তি ধারণ করল। কুকুর আর কেউ নয়, স্বয়ং ধর্ম এসেছেন ছদ্মবেশে। ধর্ম তখন যুধিষ্ঠিরের বহু প্রশংসা করে বললেন, "মহারাজ! আমি কুকুর নই. আমি ধর্ম; তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে এসেছি। সকল জীবের প্রতি তোমার সমান ভাব দেখে আমি খুশী হয়েছি। তুমি যথার্থ ই ধর্মপ্রাণ, তুমি স্বর্গে চল।"

স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। দ্রোণ বধের জন্য যুধিষ্ঠির একটি মিথ্যা কথা

বলেছিলেন। তাই তাঁকে প্রথমে নরকদর্শন করতে হল। তারপর তিনি আকাশ গঙ্গায় স্নান করে দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করলেন এবং মিলিত হলেন পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষের সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।

সকল দ্বন্দ্বের অবসান হল। অবসান হল দ্বেষ, হিংসা ও হানাহানির। স্বর্গে শুধু আনন্দ, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা।

সমাপ্ত